কুয়াশা

ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগচী, এল, এম্, এস্।

সোল এজেন্টস্
সরকার বিশ্বাস এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
~~২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা~~।

মুল্য এক টাকা মাত্র

নিবেদন

ট্র্যাজেডী না কমেডী ছাড়া অন্যান্য গল্পগুলি অনেক দিনের লেখা। **হৃদয় বিনিময়** গল্পটি **মানসী** (অধুনা-লুপ্ত) পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। স্বর্গীয় সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের ভাল লাগিয়াছিল—তিনি গল্পটির সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—"গল্পটি আরব্য উপন্যাসে স্থান পাইবার উপযুক্ত।" সমাজপতি মহাশয়ই আমাকে গল্প লিখিবার জন্য উৎসাহ দেন—তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কয়েকটি গল্প লিখি, সেগুলি প্রায়ই হারাইয়া গিয়াছে—যে কয়েকটি পাইয়াছি, পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। আশা করি পাঠকগণ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি—

গ্রন্থকার।

বাগচী-যমশেরপুর

১৩৪৮ সাল নদীয়া।

(১)

কুয়াসা

আমি ছবি আঁকিতাম। জীবিকার জন্য নয়—জীবন-ধারণের জন্য বটে। ছবি না আঁকিয়া আমি থাকিতে পারিতাম না। আমি জন্মিয়াছিলাম যেন ছবি আঁকিবার জন্য। সখের শিল্পী হইলেও আমি নিপুণ শিল্পী। আমার আঁকা অনেক ছবি দেশে বিদেশে সুখ্যাতিলাভ করিয়াছে।

সহরের বড় একটা রাস্তার উপর আমাদের বাড়ীটি—বড় না হইলেও, দেখিতে সুন্দর—যেন একখানি ছবির মত, রাস্তার দিক্‌কার একটা ঘরে আমার ষ্টুডিও। আমি এখানে বসিয়া ছবি আঁকিতাম—আর পথের দিকে অবসর মত চাহিয়া থাকিতাম। আমি কত সুন্দর সুন্দরীর ছবি আঁকিয়াছি তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কতক সত্যকার, কতক কাল্পনিক আমার নিজের মনগড়া। এত ছবি আঁকিয়াও আমার মনের তৃপ্তি হয় নাই। আমি এতদিন ধরিয়া কাহার একখানা ছবি আঁকিব বলিয়া যেন হাত পাকাইতেছি। হাত ত পাকিয়াছে কিন্তু কোথায় সে—

যার জন্য আমার এই আয়োজন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, কিন্তু কোথায় সেই সুন্দরী যাহার জন্য আমি রঙ, তুলি প্রভৃতি লইয়া বসিয়া আছি! তাহাকে যে আমার এবার আবশ্যক। সে না আসিলে আমার জীবন ব্যর্থ, ছবি আঁকা বিফল। কোথায় তুমি ওগো আমার মানস-সুন্দরী? তুমি মুহূর্ত্তের জন্য, তড়িতের মত আমার চক্ষু ঝলসিয়া যাও, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব, আমার ছবি আঁকা সার্থক হইবে।

মা আমাকে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য নানা কৌশলে, নানা ছলে কত সুন্দরী তরুণীকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আমি যে মুখখানি দেখিতে চাহি, তাহার সন্ধান ত আমাকে কেহই দিতে পারিল না। সে আমার হউক আর নাই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি শুধু তাহাকে চোখের দেখা দেখিব মাত্র। আমি শুধু তাহার একখানি ছবি আঁকিতে চাহি, আমার জন্ম সেই জন্য, সেই জন্যই আমার এত বৎসরের সাধনা।

আমার এতদিনের সাধনা বুঝি সবই ব্যর্থ হয়! মন বলে, না তাহা হইতে পারে না। পাবে তুমি তার দেখা. না হইলে সবই যে মিথ্যা। আমার মন

বলিয়াছিল। পাইয়াছিলাম সত্যই তার দেখা, অদ্ভুত অবস্থায় অদ্ভূত ভাবে ঘটে আমাদের প্রথম মিলনটি।

ডাক্তার বলিলেন, স্বাস্থ্যের খাতিরে আমার প্রত্যহ ৫।৬ মাইল বেড়ান আবশ্যক। ডাক্তারের কথায় আমি প্রত্যহ বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম। একে শীতের প্রভাত তাহার উপর সেদিন কেমন একরকম বিশ্রী কুয়াসা হওয়ায় নিকটের জিনিষ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। অভ্যস্থ পথ তাই কোন প্রকারে চলিতে সমর্থ হইতে-ছিলাম। অন্ধকারে গাড়ী ঘোড়া আসিয়া গায়ে পড়ার সম্ভব, আমি রাস্তার এক পাশ দিয়া অতি সাবধানে, ভয়ে ভয়ে চলিতেছিলাম। কিন্তু আমার সকল সতর্কতাই বিফল হইল। পিছন হইতে একখানা সাইকেল আসিয়া আমাকে এক ধাক্কা দিল, আমি পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলাম। কিন্তু আরোহী সমেত গাড়ীখানি রাস্তার ধারের ড্রেণের মধ্যে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে রমণী কণ্ঠের কাতর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। সাইকেলের আরোহী পুরুষ নয় নারী। একি অন্যায় দুঃসাহস তাহার। রমণীকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া, আমি তাহার নিকটে গেলাম, বলিলাম—"বোধ করি বেশী লাগেনি আপনার? এক কাজ করুন, আমার হাত ধরুন, আমি আপনাকে উপরে তুল্‌ছি" এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া

দিলাম, রমণী কোন কথা কহিলেন না, দুই হাত দিয়া আমার হাত ধরিলেন, আমি তাঁহাকে টানিয়া তুলিলাম। তাহার পর অতি কষ্টে গাড়ীখানি উদ্ধার করিলাম। আশা করিয়াছিলাম রমণী নিশ্চয় ইহার জন্য অন্ততঃ একটা ধন্যবাদ দিবেন। ধন্যবাদ দূরে থাকুক, রমণী এই বিপদের জন্য আমাকেই দায়ী করিলেন। রমণী বলিলেন, কিন্তু কি কঠিন মর্ম্মঘাতী তাহার কথাগুলি,—"এর পর যখন পথ দিয়ে হাটবে, দেখে শুনে চ'ল, পথের মাঝখানটা দিয়ে না গিয়ে একধার দিয়ে গেলে সকলেরই পক্ষে সুবিধা।" আমি সে সময় তাঁহার গাড়ীর লণ্ঠনটা ধরাইবার জন্য দেশালাই জ্বালিয়াছিলাম। একটা দমকা হাওয়া আসিয়া আলোটা নিভাইয়া দিল। আমি বলিলাম— "আমি ত বরাবরই একপাশ দিয়ে আসছি। আপনিই পথ ভুলে দৈবাৎ আমার গায়ে পড়েছেন—তা যে অন্ধকার, পথ ভুল হওয়া একবারেই বিচিত্র নয়। এমন দিনে সাইকেলে চড়া একবারেই নিরাপদ নয়।" রমণী কহিলেন—"নিরাপদ হয়, হেঁটো লোকগুলো যদি ঠিক পথ চলতে শিখে।" আমার বেশ একটা জবাব মনে আসিতেছিল, কিন্তু রমণী তা শোনাইবার অবসর না দিয়া সাইকেলে চাপিয়া নিমিষের মধ্যে কুয়াসায় অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। রমণীর এই ব্যবহার আমার মনে অত্যন্ত বেদনা

দিয়াছিল, একি অকৃতজ্ঞতা ! একি নিষ্ঠুর আচরণ। আমি মনে মনে বলিলাম—"অয়ি অহঙ্কৃতে ! দোষ যে কার বিধাতা যেন হাতে হাতে তা টের পাইয়ে দেন।"

আমার করুণ প্রার্থনা বুঝি তাঁহার কর্ণে পৌছিয়াছিল। বেশী দূর নয়, সামান্য একটু পথ যাইতে না যাইতে দেখিলাম, রমণী সাইকেল লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন ; আমার পায়ের শব্দ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন "কে ? আপনি নাকি ?" আমি বলিলাম "আমি বটে, তবে আপনি যাকে চান তিনি কিনা জানি না।" রমণী বলিলেন "না আমি আপনার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছি। আপনার স্বর আমার পরিচিত, এই কতক্ষণ আগে আপনার গায়ে পড়েছিলুম। দোষ আপনার নয় আমার। আমার এই অভদ্র ব্যবহারের জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত জানবেন।" রমণীর কাতরকণ্ঠ আমার হৃদয়কে দ্রব করিয়া দিল। আমি বলিলাম "না ওসব কথা আপনি কিছু মনে করবেন না। পড়ে গিয়ে আঘাত লেগে আপনি প্রকৃত অবস্থা সে সময় বুঝতে পারেন নি। দেন দিকি সাইকেলটা আমাকে—আর একটু গেলেই বড় রাস্তা, সেখানে আলোর অভাব হবে না।" তিনি রাজি হইলেন। আমরা পাশাপাশি অন্ধকারের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। আমাদের কত কথাই না হইল ! দেশের কথা, স্ত্রী-শিক্ষার কথা, অবরোধ প্রথার

কথা, স্বদেশীর কথা, এইরূপ কত বিষয়েরই না আলোচনা হইল। আমি এত কথা কি করিয়া বলিতে পারিলাম তাহাই আশ্চর্য্য। আলো থাকিলে হয় ত পারিতাম না। অন্ধকার সেদিন যেন আমাকে বাচাল করিয়া তুলিয়াছিল। কথাবার্ত্তায় বোধ হইল রমণী শিক্ষিতা এবং ভয় কাহাকে বলে তিনি তাহা জানেন না। বড় রাস্তায় আসিয়া রমণী বিদায় লইবার উদ্যোগ করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ব্রাকেট হইতে লণ্ঠনটি নামাইয়া জ্বালিয়া রাখিবার সময় রমণীর মুখখানা দেখিতে পাইলাম। কি আশ্চর্য্য! এ যে সেই মুখ!

ধন্য আমি! আমার এত বৎসরের প্রতীক্ষা আজ বুঝি সার্থক হইল! দেখিলাম মুখখানি একটি তরুণীর—এত তরুণ, কিশোরী বলিলেও অন্যায় হয় না কিছু। মুখখানিতে এত অসমঞ্জস ভাবের একত্র সমাবেশ—কালো ভুরু দুটির মাঝখানটি ঈষৎ কুঞ্চিত কর্কশভাবাঞ্জক বলা যাইতে পারে। কিন্তু চোখ দু'টী আবার করুণায় পরিপূর্ণ—বিনয়ের আধার বলিলেই হয়। পরিপূর্ণ চিবুক দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু অধরপুটে এখনও যেন শৈশবের নির্দ্দোষ চাপল্য বর্ত্তমান। প্রথম দৃষ্টিতে রমণীকে অত্যন্ত কলহ প্রিয়া বলিয়া মনে হয় কিন্তু টোলবিশিষ্ট গাল দু'টি সে ভ্রম তখনি দূর করিয়া দেয়। রমণী আমাকে ধন্যবাদ

দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

লোকে বহুমূল্য কিছু হারাইলে যেমন হয়, আমারও কতকটা সেই অবস্থা হইল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বাড়ীতে ফিরিলাম। এইত আমার মানসী প্রতিমার সাক্ষাৎ পাইলাম। পিপাসা মিটিল না সত্য। হায় মূর্খ! বিদায় কালে একটি কথাও মনে আসিল না কেন? কে জানে, এই আমাদের প্রথম ও শেষ দেখা কি না?

আমার ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িলাম। বিছানায় শুইয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল, যাহা লইয়া গিয়াছিলাম, ফিরাইয়া আনিতে পারি নাই। আমার মন সেই অপরিচিতা তরুণীর উদ্দেশে কোথায় ছুটিয়া গেল। সেই হইতে কোন কাজেই আর মন লাগে না, আমি পাগল হইব নাকি? এইভাবে তিন মাস কাটিয়া গেল। মনের কষ্ট মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া আমি যেন গুমরিয়া মরিতেছিলাম। আমার এ কথা ত অপর কাহারও কাছে প্রকাশ করিবার মত নয়। স্থির করিলাম তাহার কথা আর বৃথা ভাবিয়া ভাবিয়া মন খারাপ করিব না। কে জানে সে অপরের পরিণীতা কি না? যদিচ দৈবক্রমে আবার সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু আমার আশাত মিটিবে না। তাহার আশা আমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু সে

কি সহজ ব্যাপার? আমি যে উহারই অপেক্ষায় এতদিন বসিয়া আছি। ওরে মূর্খ! জীবন ত সত্য সত্যই একটা আস্ত কবিতা নহে, ওর আশা ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু সেই মুখখানি! সে ত ভুলিবার নয়। সব ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু সেই মুখখানি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ধরিয়াই রাখিতে হইবে।

স্মৃতির সাহায্যে সেই মুখখানি একখানা সাদা কাগজের উপর আঁকিয়া ফেলিলাম। কিন্তু যত গোল হইল তাহার পর। কি হইলে চোক দুটির সঙ্গে নাসিকাটির খাপ খায়, কচি কোমল অধর দুটির সঙ্গে চিবুকের মানান হয়। গণ্ডের কোন বিন্দুটিতে টোল খাওয়াইলে তাহার গালটি হয় এসকল কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অনেকদিন ধরিয়া ক্রমাগত ভাবিলাম, একটুও স্পষ্টতর হইল না, কুয়াসায় দেখা মুখের স্মৃতি মনের মধ্যে একটা দারুণ কু-আশারই যেন কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া তুলিল। আমার তখন কেবলই মনে হইত আর একবার যদি তাহার দেখা পাই, বিধাতা এত দয়া করিয়াছেন আর একটুখানি কি করিবেন না?

আমার জন্মতিথিতে বাড়ীতে ছোট খাট একটা উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। আজ আমার ষ্টুডিওর বারান্দায় রেলিঙের উপর ভর দিয়া আমার অতীত জীবনের আলোচনা করিতেছিলাম আর শূন্যভাবে পথের দিকে

চাহিয়াছিলাম। কত ট্রাম, কত গাড়ী সম্মুখের রাস্তাটি দিয়া যাইতেছে আসিতেছে, কত রকম-বেরকমের মানুষ কত রকম-বেরকমের পোষাক পরিয়া কত রকম-বেরকমের চিন্তা লইয়া যাওয়া আসা করিতেছে। কেহ হাসিতে হাসিতে যাইতেছে, কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে। কেহ কিছু হারাইয়া ঘরে ফিরিতেছে, কেহ কিছু সঙ্গে করিয়া বাড়ী যাইতেছে। মনে হইতে লাগিল মানুষের জীবন-নাট্য ত ঐ রাস্তাটির উপর প্রতি পলেই অভিনীত হইতেছে। কিন্তু এই নাট্যে আমার স্থান কোথায়, আমি কার ভূমিকা লইয়া এই সংসার-মঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছি।

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সহসা সেই মুখখানা একখানা ট্রাম-গাড়ীর মধ্যে দেখিতে পাইলাম। আমি তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যাহা পাইলাম পায়ে দিয়া ছুটিয়া গিয়া ট্রামে উঠিলাম। রমণীর সম্মুখে যে বেঞ্চখানা ছিল তাহারই একস্থানে বসিয়া মনের সুখে সেই মুখখানি দেখিয়া লইতে লাগিলাম। যত দেখি ততই যেন আপনার মনে হয়। রমণীকে কিছু চঞ্চল হইতে দেখিলাম। তাঁহার কোলে একটা মনিব্যাগ ছিল সেইটার মধ্যে কি যেন খুঁজিলেন, যাহা খুঁজিতেছিলেন বোধ হয় না পাওয়ায় বেঞ্চের নীচটা দেখিলেন তথাপি পাইলেন না। তখন কন্‌ডাক-টারকে গাড়ী থামাইতে বলিলেন। তাঁহার একটী

সোভারিং নীচে পড়িয়া গিয়াছে। ট্রাম থামিলে তিনি নামিয়া পড়িলেন, আমিও তাহাই করিলাম। রমণী আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন, কোন কথা কহিলেন না। আমরা কি খুঁজিতেছি দেখিয়া একটি দুইটি করিয়া অনেক লোক আসিয়া জমা হইল। ইহাদের প্রায় সকলেই ইতর লোক—দুই একটি ভদ্র গোচ লোকও ছিল। লোকের ভিড় হওয়ায় রমণীকে যেন কিছু বিরক্ত হইতে দেখা গেল। তিনি কহিলেন—"আমার জিনিষ পড়ে গিয়েছে, আমি খুঁজছি তোমাদের ভিড় করে দাঁড়াবার কি আবশ্যক?" তাঁহার কথায় অনেকে চলিয়া গেল, যাইবার সময় যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গেল, তাহা কোন প্রকারেই সুরুচি সঙ্গত বলিতে পারা যায় না। আমার এ সকল দিকে একেবারেই লক্ষ্য ছিল না। একটা হেয়ার পিন্ রমণীর মাথা হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। আমি তাঁহার অজ্ঞাতসারে সেটি কুড়াইয়া লইয়া পকেটে রাখিলাম, একটা ভিখারীছেলে তাহা দেখিতে পাইয়াছিল। সে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"এই আপনার জিনিষ পেয়েছে, এখনই পকেটে পুরল, আমি দেখেছি।" রমণী সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূকুটি ভরে আমার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমার সোভারিং নিয়াছ?" আমি বলিলাম "না"। ভিখারী-বালক কহিল—"কি? মিথ্যে কথা। আমি যে

তোমাকে এখনই পকেটে পুরতে দেখলাম।” আমি বলিলাম—“কখনই না।” সে কহিল—“বাপ্‌রে এত বড় জুয়াচোর।”

আচ্ছা তুমি পকেটে কিছু রাখনি?

আমি বললাম—“হ্যাঁ রেখেছি।”

সে কহিল—“তবে যে?”

আমি কহিলাম—“সোভারেন পাইনি।”

সে কহিল—“তবে কি পেয়েছ বলে ফেল চাঁদ।”

আমি কহিলাম “সে কথা বলব না।”

বালক কহিল—“বলকি না বল বুঝিয়ে দি, যদি এই মেয়েটি—”

রমণী কহিলেন,—“আমার কাজ আমি বুঝব তোমার এর মধ্যে আসার কি আবশ্যক” সে কহিল—“ওঃ বাবা ঠাকরুণ যে সে মেয়ে নয়।” রমণী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন “যতটা বুঝছি তুমিই আমার সোভারেণ নিয়েছ এখন ওটা দেবে কিনা বল?”

আমি বলিলাম—“পেলে অবশ্যই দিতাম।” তিনি কহিলেন “এই ত তুমি নিজের মুখে স্বীকার করলে পকেটে কি একটা রেখেছ সে-টা কি তবে?”

আমি কহিলাম—“মাপ করবেন আমাকে, আমি তা কিছুতেই বলব না।” রমণী ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—“তা’ হ’তেই

পারে না, তোমাকে বলতেই হবে।” আমি তথাপি বলিলাম—“কিছুতেই বলব না।”

ভিখারী বালকটি কহিল—“আপনি যদি বলেন একটা পাহারাওয়ালাকে ডেকে আনি, রুলের গুতোয় আপনি বলবে। দেখ্ছেন না লোকটা আসল জুয়াচোর।”

রমণী আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন—“কি বল তুমি পুলিস ডাকি তা'হলে ?”

আমি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বল্লাম—“সে আপনার ইচ্ছে. কিন্তু মনে রাখবেন এর জন্য পরে আপনাকে মনস্তাপ পেতে হবে।” আমার কথায় রমণীকে কিছু বিস্মিত হইতে দেখা গেল। কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণ-কালের জন্য নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার বিশ্বাস আমি তাঁহার সোভারেণটি পাইয়া মিথ্যা কথা বলিতেছি। একটা পাহারাওয়ালা নিকট দিয়া যাইতেছিল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন “দেখ কনেষ্টবল, এই লোকটা আমার একটা সোভারেণ কুড়িয়ে পেয়েছে, দিচ্ছে না।”

ভিখারী বালকটি কহিল—“হাঁ কনেষ্টবল সাহেব আমি নিজের চোখে পকেটে রাখতে দেখেছি।” মৎস্যের সন্ধান পাইলে বিড়ালের যে আনন্দ, আমাকে এই অবস্থায় পাইয়া পাহারাওয়ালার মনে সেইরূপ আনন্দ হইতে দেখা গেল,

আমাকে সোভারিণের কথা জিজ্ঞাসা করায়, আমি তাহা অস্বীকার করিলাম। আমি কহিলাম—"সোভারেণ পাইনি, অন্যকিছু পেয়েছি।" কি সে জিনিষ জিজ্ঞাসা করায় আমি কহিলাম—"আমি তা কিছুতেই বলব না।" "তবে থানায় চল" বলিয়া আমার হাত ধরিয়া থানার দিকে লইয়া চলিল, রমণীকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইল। আর চলিল সেই ভিখারী বালকটা আমার কি হয় না হয় সেটা না দেখিলে যেন তার রাত্রে নিদ্রা হইবে না।

এতক্ষণ ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ একটা তামাসার মত বোধ হইতেছিল, কিন্তু থানায় আসার পর ব্যাপারটা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। দারোগা সাহেবের আজ্ঞায় একটা কনেষ্টবল আমার পকেট দেখিতে আরম্ভ করিল। বুকের পকেট হইতে কতকগুলি সিকি দুয়ানীর সহিত একটা সোভারেণ বাহির হইয়া পড়িল। তখন আমি যে চোর সে বিষয়ে উপস্থিত সকলের মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। এ সোভারিণটি আমারই, আজ জন্মদিনে মা এইটি দিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা কে বিশ্বাস করিবে? আমি বলিলাম—"এ সোভারেণটি আমারই—আমি যখনই বাইরে যাই টাকা সিকির সাথে একটা সোভারেণ নিয়ে বা'র হই।" দারোগা সাহেব আমার জুতা ছাতার দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হাঁ

সোভারেণ রাখার মত অবস্থাই বটে, জুতো আর ছাতাতেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে।" আমি বলিলাম—"তাড়াতাড়িতে ছুপায়ে ছুরকম জুতা প'রে এসেছি।" দারোগা সাহেব হাসিয়া কহিলেন—"আর এ অপূর্ব্ব ছাতাটি?" আমি কহিলাম—"ওটা মালীর ছাতা, ওটাও তাড়াতাড়িতে ভুলে এনেছি।" একটু মৃদু হাসিয়া দারোগা কহিলেন—"এত তাড়াতাড়ি! ব্যস্ততা কিসের জন্য জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি?" আমার কাতর দৃষ্টিতে রমণীর মুখের পানে একবার চাহিলাম। দারোগা আমাকে হাজতে লইয়া যাইতে বলিলেন। আমি যাইবার আগে রমণীর মুখের দিকে একবার চাহিলাম—দেখিলাম তাঁহার ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার বদন-মণ্ডলে বেদনা কাতরতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

আমাকে গারদে পুরিয়া যখন দরজা বন্ধ করিয়া দিল, তখন আমার মনে হইল, এখন কি করা যায়? আমি আমার নাম-ধাম কিছুই প্রকাশ করি নাই। কোন বন্ধুকে খবর দিবার ইচ্ছাও তখন ছিল না। কিন্তু গারদে সময় কাটাই বা কি করিয়া? পকেটে কাগজ পেন্সিল ছিল, বাহির করিয়া রমণীর মুখখানি আঁকিয়া ফেলিলাম। এবার আর কোন গোল হইল না। আপন মনে ছবিখানা দেখিতেছি এমন সময় গারদের দরজা খোলার শব্দ কানে

প্রবেশ করিল। একটা কনেষ্টবল আমাকে লইয়া দারোগা সাহেবের কাছে উপস্থিত করিল। দেখিলাম রমণী দারোগার পার্শ্বে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার বদন-মণ্ডল আরক্তিম ও কতকটা বিষণ্ণ যেন। আমি যাইবা মাত্র আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। কি আশ্চর্য্য সে চাহনি। লজ্জা, অনুতাপ ও ক্ষমা-ভিক্ষা যেন তাহাতে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

দারোগা সাহেব কহিলেন—"ইনি এইমাত্র ফিরে এসে বল্‌ছেন, তাঁর সোভারেণটি হারায়নি, সেই কারণে ইনি তোমাকে আর আসামী করতে চান না।" রমণী কহিলেন—"হাঁ। এখান হতে যাওয়ার পর হঠাৎ আমার মনে পড়ল, সোভারেণটি মনিব্যাগে রাখিনি, অন্যত্র রেখেছিলাম। আমার এই ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত জানবেন।"

কোথায় গেল তাঁর পূর্ব্বের সে ঔদ্ধত্য আর দৃঢ়তা! আমি একটু হাস্য সহকারে কহিলাম—"না, না, আপনি দুঃখিত ও লজ্জিত হবেন না, আপনার যে ভুল হয়েছে তা আমি জানতাম, আমার সে সময় আপনার জন্য একটু ভাবনা হয়েছিল, নিজের জন্য একটুও চিন্তা হয়নি।" রমণী কপালের চামড়া একটু কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—"আপনার মহত্ত্বের তুলনা নাই।" দারোগা ছাড়িবার পাত্র নহেন,

তিনি রমণীকে মৃদুমন্দভাবে দুকথা শুনাইয়া দিতে লাগিলেন, আর তিনি ঘাড় হেট করিয়া নীরবে শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বলিলাম—"আসুন আমরা বাহিরে যাই।"

আমরা উভয়ে থানার ফটক পার হইয়া রাস্তায় পড়িলাম। আমি বলিলাম, "দেখুন, আজকার এই ব্যাপারের জন্য আপনিই যে একা দোষী আমার কোন দোষ নাই তা মনে করবেন না, আমার ব্যবহারে এমন কিছু প্রকাশ পেয়েছিল, যাতে আমার উপর আপনার সন্দেহ হওয়া একান্তই স্বাভাবিক।"

রমণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন,—"না, না, আপনি আমার অপরাধ লঘু করতে চেষ্টা করবেন না। আমার চরিত্রের প্রধান দোষ নিজের মতকে নির্ভুল বলে মনে করা, একরকম একগুঁয়েমি আর কি! এর জন্য আমাকে কত লাঞ্ছনা কত গঞ্জনাই সহ্য করতে হয়।"

আমি হাস্য সহকারে কহিলাম—"হাঁ, তা বটে, যেমন সেদিন, অন্ধকারে এক জনের গায়ে পড়ে গিয়ে, নিজেকে দোষী মনে না করে বেচারা পথিকটির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া।"

রমণী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"আমার এত আগেই মনে হচ্ছিল

আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি—আপনার স্বর যেন নিতান্ত অপরিচিত বলে মনে হচ্ছিল না।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার বদনমণ্ডল যেন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম—"আমার ভয় হচ্ছিল, আপনি বুঝি সে দিনকার কথা ভুলে গিয়ে থাকবেন।" রমণী কোন কথা বলিলেন না—কেবল ঘাড় নাড়িলেন। কিছুক্ষণ পর কহিলেন—"সেদিনকার সেই ঘটনার পর আমি কত দিন মনে করতাম—যদি আপনার সঙ্গে আর একবার দেখা হয়—আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিয়ে মনের ভারটা হালকা করি। দেখা যদি হল ধন্যবাদত দুরের কথা আপনাকে নূতন এক বিপদে ফেলবার কারন হয়ে দাঁড়ালাম।"

আমি কহিলাম—"এবার যে আবার এমন দিনে, যে দিন আমার জন্ম তিথির উৎসবে আমাদের বাড়ী আত্মীয় কুটুম্বে পরিপূর্ণ।"

রমণীর কপালের চামড়া গভীর কুঞ্চিত হইল, তাঁহার অধর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। রমণী কহিলেন—"আপনার জন্মতিথির উৎসব হ'ল থানার গারদে।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁর মুখ বিবর্ণ হইল, দু ফোটা অশ্রু তাঁহার গণ্ড বহিয়া পড়িল। আমি কাতর কণ্ঠে বলিলাম—"আপনি অমন করে কেঁদে আর আমাকে কষ্ট দেবেন না। আজ সকালে আমি যে আনন্দ পেয়েছি বোধ করি এ

জীবনে আর তা পাব না। সমস্ত পৃথিবী হাতে পেলেও আমি আজকার সকালটা তার সঙ্গে বিনিময় ক'রতে পারিনা। যথার্থই আজ আমার জন্মোৎসব। এমন উৎসব জীবনে আর কখনও হয়নি।"

ইহার পর আজকার ঘটনা আমি তাঁকে একে একে সমস্ত বিবৃত করিলাম। শেষে হেয়ারপিনের কথা বলিলাম, তিনি স্থিরভাবে শুনিয়া যাইতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে একটি করিয়া গভীর শ্বাস ফেলিতেছিলেন। আমি বলিলাম "হেয়ারপিনটি মাটিতে প'ড়বামাত্র কুড়িয়ে পকেটে রাখি। উদ্দেশ্য ওটিকে জীবনের সঙ্গী ক'রব। এখন আর লুকিয়ে রাখবার আবশ্যক নাই।" এই বলিয়া হেয়ারপিনটি তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। তাঁহার গণ্ডদেশ রাঙা হইয়া উঠিল। চোক দু'টি দিয়া যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"এই সামান্য জিনিষটির প্রতি আপনার এত লোভ! আপনার জন্মতিথি উপলক্ষে আমি অমন দশটা হেয়ারপিন আপনাকে উপহার দিব। আশা করি আপনার হৃদয় যিনি অধিকার করেছেন তাঁকে এই পোড়ারমুখার কথা ব'লে ব্যবহার করতে দিবেন। তা'হলেই আমার এই দুর্বৃত্ত আচরণের কথা জীবনে আর ভুলতে পারবেন না। হয়ত এই কালা-মুখীর কালোমুখ জীবনে মন হতে কোনকালেই দূর

হবে না।" তাঁহার বদন মণ্ডল কুয়াসার মত ঘোলাটে হইয়া উঠিল ; একটা যেন জমাটবাঁধা ব্যথা তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী মলিন করিয়া তুলিল।

আমি বলিলাম—"তবে দুঃখ এই এ হৃদয় দখল ক'রতে এই দীনের কুটীরে একাল পর্য্যন্ত পদার্পণ ঘটল না। আর যিনি আমার মন হরণ করেছেন তাকে পাব কি না জানি না। আমি তাঁর ছবি একে রেখেছি, দেখুন ত ঠিক হ'ল কিনা?" এই বলিয়া ছবিখানি তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। তিনি স্তম্ভিত, বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইয়া আমার হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন "তুমি আমারই, তুমি আমারই, আমার হৃদয় যা চায় তুমি তাই. তুমি তাই।" এইরূপে পথের মাঝখানে আমাদের মিলন হইয়া গেল। আমি বলিলাম—"এস তবে আমাদের বাড়ীতে, জন্মদিনে আমি যে কি রত্ন পেয়েছি মাকে দেখাইগে ও তাঁর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিগে এস।"

(২)
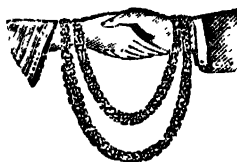
হৃদয়-বিনিময়

— ১ —

তকীপুরে কাশিম আলি নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। কাশিম অত্যন্ত নির্ম্মম প্রকৃতির লোক ছিল। দয়া, মায়া, স্নেহ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলি তাহার হৃদয়ে একবারেই স্থান পাইত না। সংসারে আসিয়া সে চিনিয়াছিল শুধু অর্থ—আর অর্থের জন্য না করিতে পারিত এমন কাজও ছিল না। কাশিম অত্যন্ত কৃপণ ছিল। মানুষ যদি কৃপণ হয় তাহা হইলে অর্থের প্রতি তাহার একান্ত অনুরাগ থাকিতে দেখা যায়। কাশিমেরও ইহা ছিল, কিন্তু তাহার কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অর্থদ্বারা পরপীড়নের সুবিধা হয় বলিয়াই কাশিম অর্থকে ভালবাসিত। তাহার দ্বারা কত জনেরই যে ভিটামাটি এককালীন নষ্ট হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। লোকে বলিত কাশিমের হৃদয় বলিয়া কিছু নাই. এ অবশ্য লোকের মস্ত ভুল। হৃদয় ছাড়া কি মানুষ হয়! ভাল হউক, মন্দ হউক প্রত্যেকেরই হৃদয় বলিয়া একটা কিছু থাকিবেই; কাশিমেরও ছিল, কিন্তু সেটা পিশাচের—ঘোরতর নারকীয়।

সংসারে আপনার বলিতে কাশিমের বড় একটা কেহ ছিল না। নীহার নামে একটি ১৫ বৎসরের বালিকা তাহার গৃহের তাবৎ কাজ করিত। নীহার শিশির-স্নাত ফুটনোম্মুখ গোলাপের কলিকার মত অনিন্দ্য সুন্দরী,—আর তার স্বভাবটীও তাহারই মত তুল্য-মনোমুগ্ধকর। এই বালিকা কাশিমের খানা পাকাইত, কাপড় কাচিত, ঘর দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিত। এক কথায় সংসারের সমস্ত কাজ করিত। এত করিয়াও কিন্তু সে দুর্ব্বৃত্ত কাশিমের মন পাইত না। কাশিম উঠিতে বসিতে, যখন তখন উহাকে নির্দ্দয় ভর্ৎসনা করিত। কাশিমের সহিত নীহারের একটা সুদূর সম্বন্ধ ছিল কিন্তু সে সূত্রে এখানে আসে নাই। নীহারের পিতা পত্নীর চিকিৎসার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কাশিমেব কাছে কিছু অর্থ গ্রহণ করেন। নীহারের মাতা সে যাত্রা রক্ষা পান না। প্রিয়তমা পত্নীর শোকে এবং ঋণের ভাবনায় নীহারের পিতা শয্যাশায়ী হয়েন। পিতাকে অঋণী করিবার জন্য সরলা বালিকাকে কাশিমের গৃহে দাসীপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। কিছুদিন পর তাহার পিতাও তাহার মাতার অনুগামী হয়েন। নীহারের আর কোথাও যাওয়া হইল না, সে কাসেমের গৃহেই থাকিয়া গেল।

তকীপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাশিমের গৃহখানিকে শ্মশানের মত ভয় করিত। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে ইচ্ছা করিয়া কেহ তাহার চৌকাঠ মাড়াইত না। কেবল ফতেমা বিবি নামক একটী বর্ষিয়সী স্ত্রীলোককে মধ্যে মধ্যে তাহার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখা যাইত। এই ফতেমা বিবি একাদিক্রমে চারিটী স্বামীকে কবরস্থ করিয়া অবশেষে কাশিমের স্কন্ধে আরূঢ়া হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কাশিমেরও বড় একটা আপত্তি ছিল না—কেননা উভয়ের প্রকৃতি অনেকটা একরকমের, আর ফতেমার হাতে কিছু অর্থও নাকি ছিল।

তকীপুরে মামুদ নামে একটী সহৃদয় সুন্দর যুবক ছিল। মামুদকে কাশিম দুই চোখের বিষের ন্যায় জ্ঞান করিত। ইহার একটা নিগূঢ় কারণও বর্ত্তমান ছিল। প্রথমতঃ—মামুদ বড় ভাল—তাহাকে সকলেই স্নেহ করিত। যাহা কিছু ভাল, সুন্দর কাশিম তাহা পছন্দ করিত না। দ্বিতীয়তঃ—নীহারের সহিত মামুদের অত্যন্ত ভালবাসা জন্মিয়াছিল। মামুদ তাহার করপ্রার্থী হইয়াছিল। বিনা-বেতনে গৃহকর্ম্ম-নিপুণা একজন পরিচারিকা হাতছাড়া হয়—কাশিম কিছুতেই ইহা সহ্য করিতে পারিত না। সে কি করিয়া মামুদকে জব্দ করিতে পারিবে দিন রাত তাহারই

চিন্তা করিত। অবশেষে একদিন কি একটা কৌশল উদ্ভাবন করিয়া মামুদের অপেক্ষায় বসিয়াছিল। এমন সময় দূরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। মামুদ মনে করিয়া কাশিমের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু এ কি! এ যে দেখছি একটা ফকির! এ ফকিরকে সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। এ কিসের উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছে? কাশিম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল।

তখন দিবসের আলো নির্ব্বানপ্রায় হইয়া আসিয়াছে—ফকিরের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। সুদীর্ঘ শ্বেত-শ্মশ্রু-মণ্ডিত বদন বার্দ্ধক্য ব্যঞ্জক হইলেও ফকিরের অঙ্গচালনায় যুবার মত ক্ষিপ্রতা আর তাহার চোখ দু'টীতে অসামান্য উজ্জ্বলতা বিদ্যমান। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই ফকির ব্যাঘ্র চর্ম্মখানি বিস্তার পূর্ব্বক কাশিমের সম্মুখে উপবেশন করিল। রাগে কাশিমের সর্ব্বগাত্র কম্পিত হইতে লাগিল। সে কহিল "কে তুমি এখানে?"

"দেখছ ত বাপু,—সংসার-বিরাগী উদাসীন ফকির।"

"তা ত দেখছি, কিন্তু আমার এখানে সাধু সন্ন্যাসী কেন? ও পাড়ায় ভাদু মিঞার বাড়াতে যাও—ফুলিয়া বিবির সন্তানাদি হয় না—ওষুধ পত্র, মন্ত্র তন্ত্র যা জান দেও গে, পয়সা মিলবে।" এই বলিয়া কাশিম হিসাবের খাতা পত্র দেখিতে মন দিল।

একটু গম্ভীর স্বরে ফকির কহিল—"বাপু কাশিম, আমি তোমার কাছে কিছুর প্রার্থী হ'য়ে আসি নি, আমি বরংচ তোমাকে কিছু দিতেই এসেছিলাম। বৎস কাশিম আলি, সংসারে কি তোমার কিছুরই অভাব নাই? তোমার কি কিছুই চাওয়ার নাই?"

"উপস্থিত তুমি আমার বাড়ী ছেড়ে যাও—আমার এই মাত্র প্রার্থনা।"

"তোমার সে ইচ্ছা তো এখনই পূর্ণ হবে, কিন্তু যাবার আগে তোমাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করি—কাশিম তুমি কি সত্যই কিছু চাও না! ভেবে চিন্তে উত্তর দিও। বৎস কাশিম, লোকে বলে তোমার হৃদয় ব'লে কিছুই নাই। দুর্ণামটা দূর করার জন্য তোমার একবার কি ইচ্ছা হয় না? ভেবে দেখ কাশিম—পৃথিবীতে এসে তুমি কি করেছ,—নির্ম্মম নিষ্ঠুর আচরণ, লোকের সর্ব্বনাশ, পাশব বৃত্তির অনুশীলন। এ সবে যে সুখ তা ত তুমি যথেষ্টই ভোগ করেছ। এখন একবার ভাল হ'য়ে দেখলে হয় না? লোকের অভিশাপ তুমিত অনেক কুড়িয়েছ, এখন একবার তাদের আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রতে চেষ্টা করলে হয় না? শুন কাশিম—আমার নিকট এমন একটা ওষুধ আছে, যা খেলে ইচ্ছামত হৃদয়-বিনিময় সম্ভব। আমরা উদাসীন ফকির, ওষুধ দিয়ে অর্থ গ্রহণ করি না।" এই বলিয়া তাহার স্কন্ধের

ঝুলির মধ্য হইতে একটা শিশি বাহির করিল। শিশিটী দেখিতে ভারি সুন্দর এবং ইহার গাত্রে বিবিধ কার্য্য করা। কাশিমের সম্মুখে শিশিটী স্থাপন করিয়া ফকির কহিল "এই লও, এতে চারবারের মত ওষুধ আছে। যার সাথে হৃদয় বিনিময় ক'রবে তাকে ও তোমাকে খেতে হবে। কোনরূপ নিয়ম পালন করার আবশ্যক নাই। কেবল সেবন কালে বলতে হবে—'তোমার হৃদয় আমার হোক—আমার হৃদয় তোমার হোক।' বাস্,—তারপর ওষুধের ক্রিয়া স্বচক্ষে দেখতে পাবে।" এই বলিয়া ফকির যাইবার উপক্রম করিল,—সহসা কি মনে হওয়ায় পুনরায় কহিল—"বাপু কাশিম আলি, তোমার হয়ত এরূপ মনে হ'তে পারে—তোমার মত দুর্ব্বৃত্তের সাথে ইচ্ছা করে কে হৃদয় বিনিময় ক'রতে চাবে? তা চায়। সংসারে অর্থ দ্বারা না হয় এমন কাজ নাই। খোদা তোমাকে বিস্তর অর্থ দিয়াছেন। তবে একটা কথা কি জান বাপু—কোন বুড়ার সঙ্গে যেন হৃদয় বিনিময় ক'রতে যেয়ো না। তারা ঝুনো নারকেল, চাই কি—তোমার অর্থের দাঁত নাও বসতে পারে। বেশ একজন নব্য ভব্য যুবা মনোনীত কর, তোমার কার্য্য সিদ্ধ হবে। যুবাদের বিস্তর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, অর্থে তাদের বিশেষ আবশ্যক। কাশিম তুমি চট্ ক'রে এমন একটা যুবাকে মনোনীত

কর যার অবস্থা তেমন ভাল নয়, অথচ উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অভাব নাই।"

ফকির চলিয়া গেল। সে যখন কথা কহিতেছিল, কাশিমের যেন জ্ঞান ছিল না; সহসা তাহার চৈতন্য হইল। ফকির প্রদত্ত ঔষধের শিশিটা দূরে ফেলিয়া দিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিল, অমনি তাহার সৌন্দর্য্যে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল—আর উহা ফেলিতে পারিল না, হিসাবের কাগজ পত্রের মধ্যে রাখিয়া দিল।

কিছুক্ষণ বাদ সত্য সত্যই মামুদ আসিয়া উপস্থিত হইল। মামুদ কহিল—"দেখ কাশিম চাচা, সেদিন বাস্তবিক তোমার সাথে অন্যায় ঝগড়া কচ্ছিলাম। আমি নিতান্ত দরিদ্র। সে সময় নীহারকে বিয়ে ক'রে তাকে অসুখী করা আমার কোন মতেই উচিত হ'ত না। তুমি শুনে সুখী হবে এখন আর আমি দরিদ্র নই।"

"হাঁ আমি কিছু কিছু শুনেছি বটে—তুমি নাকি তোমার মামুর বিষয় সম্পত্তি হাতে পেয়েছে?"

"না—হাতে ঠিক এখনো পাইনি, তবে আমার জ্ঞাতিদের সাথে যে মামলা হচ্ছিল তাতে আমরা জয়লাভ করেছি।"

"একেই বলে গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল, মামলা জিতলেই কি বিষয় হয়? কে জানে তারা হাইকোর্ট করবে কিনা, আর সেখানে যে রায় ঠিক থাকবে তারই বা নিশ্চয়তা, কি?"

'না, হাইকোর্ট আর তারা করতে চায় না। একেইত একরকম সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে—হাইকোর্ট ক'রবে তার টাকা পাবে কোথায় ?"

"ছেলে মানুষ কিনা! আরে টাকার অভাবে কি মামলা বন্ধ থাকে ? টাকা কতজনে যোগাবে।" মামুদ কহিল "আমাদের তেমন শত্রু কেউ আছে ব'লে ত মনে হয় না।" কাশিম কহিল "শত্রু কাহারো বড় একটা থাকে না, কিন্তু কাজের সময় কে শত্রু কে মিত্র তাও চিনে উঠা যায় না। তা বেশ! তোমাদের অবস্থা ফিরেছে—সুখের বিষয়। তুমি বোধ করি এখন হতে মামার বাড়ীতেই বাস ক'রবে ?"

"নীহার আর আমার সেই ত ইচ্ছে, কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হ'চ্ছেন না। তিনি বলেন—শ্বশুরের ভিটেটায় সন্ধ্যে প'ড়বে না।"

কাশিম কহিল "সে ত সত্য কথা। ভাল মামুদ তোমার বাপের কতকগুলো দেনা-পত্র ছিল শুনেছিলাম, সেগুলোর কোন কুল-কিনারা হ'য়েছে ব'লতে পার ?"

"আর মশায়, বাবার ওই চিন্তেই ত কাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে সুবিধা এই যে—আমার অনুরোধে যারা টাকা পাবে র'য়ে স'য়ে নিতে রাজী হয়েছে।" কাশিম কহিল "তা'হলে নীহারের সাথে তোমার বিয়ে একরকম

স্থির হয়ে গিয়েছে ?" মামুদ কহিল "হাঁ—সবই একপ্রকার ঠিক, এখন কেবল তোমার মতের অপেক্ষা।"

"আমার মতের অপেক্ষা ক'রতে গেলে কিছুদিন দেরী ক'রতে হবে।"

"বেশ ত! দু'মাস ছ'মাসে আর কি আসে যায় ?" মামুদের কথাগুলি কাশিমের কাণে কেমন যেন বেসুর ঠেকিল। সে মনে করিয়াছিল মামুদ অধৈর্য্য হইয়া কত কি বলিবে, কত রাগ করিবে, কিন্তু এযে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। দুষ্ট কাশিম মামুদকে উত্যক্ত করিবার জন্য পুনরায় কহিল-- "দেখ মামুদ তোমাকে স্পষ্টই বলি, নীহারের সাথে তোমার কিছুতেই বিয়ে হচ্ছে না, আমি বেঁচে থাকতে ত নয়।"

ক্রুদ্ধস্বরে মামুদ কহিল—"তবে তোমার অমতেই আমাদের বিয়ে হোক্।"

"আচ্ছা তাই হোক্। কিন্তু মামুদ, তুমি যে ব'ল্‌ছিলে তোমাদের পাওনাদাররা সকলে ভাল মানুষ; সেটা তোমার মস্ত ভুল। অন্ততঃ তাদের মধ্যে এমন একজন আছেন, যিনি বড় সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি যে তোমার ভদ্রাসন বাড়ীখানি না বেচিয়ে স্থির হবেন আমার তা মনে হয় না। তুমি যেমন তোমার বড় সাধের নীহারকে বিয়ে ক'রে বাজনা বাজিয়ে বাড়ীতে যেই ঢুক্‌বে, অমনি হয়ত দেখবে— আদালতের ডিক্রিজারীর পেয়াদারা ঢোল পিটিয়ে তোমার

পৈতৃক বাড়ীখানি নিলামে তুলে দিয়েছে।" কথাগুলি বলিতে কাশিমের মুখে আর হাসি ধরে না। সে হাসিতে হাসিতে যেই হিসাবের কাগজগুলি গোছাইতে যাইবে অমনি ফকির-প্রদত্ত ঔষধের শিশিটীর উপর হাত পড়িল,—আর অমনি তাহার মনে হইল—ফকিরের ঔষধটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয় না!

মামুদ তখন যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। কাশিম তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—"তুমি নিশ্চয় মনে করেছ আমি লোকের সাথে এমন নির্দ্দয় ব্যবহার করি কেন! আমারো সময় সময় মনে হয়—লোকের ভাল না ক'রে মন্দ করতে আমার এত ইচ্ছে হয় কেন? কি হ'য়েছে জান, আমার হৃদয়টাই নাকি ভারি মন্দ। ভাল হ'তে আমার ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু এ হৃদয় নিয়ে তার ত কোন সম্ভাবনা নাই! কেউ যদি আমার হৃদয়টা নিয়ে তার হৃদয়টা আমাকে দেয়! তুমি আমার কথা শুনে হাসছ, আর ভাবছ হৃদয়ের কি আবার অদল বদল হয়? না হে তা নয়! দ্রব্যগুণে অসম্ভবও সম্ভব হয়। এই দেখ একজন ফকির আমাকে এই ওষুধটী দিয়েছে, এর দ্বারা অনায়াসে হৃদয়ের বিনিময় করা যায়। আমার একান্ত ইচ্ছা—তুমি আমার সাথে তোমার হৃদয়ের বিনিময় কর। আমার দিন ত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। যে ক'টা দিন আছি জীবনটা একবার ভাল

করে ভোগ ক'রে নিই। তুমি যা চাবে আমি এই দণ্ডে তোমাকে তা দেব। তুমি শুধু তোমার হৃদয়টী আমাকে দেও। এই লও তোমার বাপের খত, আমি তাকে ঋণমুক্ত ক'রে দিলাম। এই লও একতাড়া নোট—বোধ করি হাজার টাকা হবে।"

এই বলিয়া কাশিম দুইটা পাত্র আনিল। তাহাতে ঔষধ ঢালিয়া একটা মামুদকে দিল একটা নিজে রাখিল।

"মামুদ চক্ ক'রে ঔষুধটুকু গিলে ফেল দেখি। বল—'তোমার হৃদয় আমার হোক্, আমার হৃদয় তোমার হোক্'।" এই বলিয়া কাশিম প্রথমে পান করিল। তাহার পর মুখামুখি করিয়া উভয়ে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। মামুদ কহিল—"কাশিম চাচা আমি তবে উঠি এখন।" কাশিম "হাঁ—এস বাপধন, নোটগুলো আর দলিল খানা নিয়েছ তো?" "তা কি আর ভুল হয়" বলিয়া মামুদচলিয়া গেল।

মামুদ চলিয়া গেলে কাশিম ভাবিল "হায়! এ আমি কি ক'রলাম: ভণ্ড ফকিরের কথায় আচ্ছা ঠকলাম। ওষুধের দ্বারা কি হৃদয়ের বিনিময় হয়?" খাতাপত্র গুছাইতে গুছাইতে কাশিমের মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল, বসিয়া থাকিতেও কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, শুইয়া পড়িল। তারপর কি হইল কাশিমের মনে নাই।

— ২ —

কাশিমের যখন চৈতন্য হইল, তখন আর রাত্রি ছিল না; পূর্ব্বাকাশে উষার আলোক দেখা দিয়াছিল। কতকগুলি সদ্য সুপ্তোত্থিত কাক কা-কা রবে বিহঙ্গমকুলের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছিল। ঘুম ভাঙ্গার পর কাশিম ভাবিল "এ কি! ও! সে এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল, অথচ নীহার তাকে ডাকে নি? এ নীহারের ভারি অন্যায়।" নীহারকে ভৎ‍র্সনা করিবার জন্য কাশিম শয়নাগারের দিকে ধাবিত হইল। কাশিম দেখিল—তাহার অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত্নের সহিত সজ্জিত রহিয়াছে, আর তাহার নিকটে একটী কিশোরী বালিকা ভূমির উপর ঘুমাইয়া রহিয়াছে। কাশিম এক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কাশিম দেখিল বালিকা অতিশয় সুন্দরী, এত সুন্দর কাসিম কখনো দেখে নাই। কিবা তাহার মুখের শোভা! কিবা তাহার গায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ! কিবা সুন্দর কেশদাম! কাশিম একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"হায়! হায়! এমন রূপ, এমন যৌবন তার নয়নে পূর্ব্বে কেন পড়ে নাই! এখন কি আর তার সময় আছে! তার জীবনটা কি নিরর্থক হ'ল!" কাশিম ক্রমে চিনিল—এ বালিকা আর কেহ নহে, সেই চির উপেক্ষিতা নীহার—তাহার অন্ন পাহারা দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাশিম ভাবিল

"নীহার সহসা এমন সুন্দর হ'ল কি করে? সে তো তাকে সর্ব্বদাই দেখছে—এত রূপ ত কখনো দেখে নি। এ কি তার মনের ভাবান্তর না অন্য কিছু?" সহসা রাত্রের কথা মনে হওয়ায় কাশিম কহিল—"বুঝেছি ফকির তোমার ওষুধের অসামান্য শক্তি।"

— ৩ —

কাশিম মনের আবেগে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কাশিমের চোখে আজ সমস্ত জগৎ নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বাকাশে বালসূর্য্য উদিত হইয়াছে, কাশিম দেখিল—সূর্য্য বড় সুন্দর। সূর্য্যের কণক ছটা গায়ে মাখিয়া বৃক্ষ-বল্লরী যেন হর্ষোৎফুল্ল! চারিদিকে যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্রোত বহিয়া যাইতেছে। পাখীর কুজনে, প্রভাত সমীরণে, নদীর কল কল তানে, বিবিধ পুষ্প-সৌরভে, জগতের প্রত্যেক পদার্থ হইতে যেন একটা উদ্দাম অবিরাম আনন্দরাগ উঠিয়া কাশিমকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাশিম কহিল—"হা আল্লা! আমি এতদিন কি ভুলই না ক'রেছি। পৃথিবী যে এত সুন্দর এ ত আমি আগে টের পাই নি। আজ আমি নূতন জীবন পেলাম, জীবনের তপ্ত সুরা পেয়ালা ভ'রে পান করে নেব।"

একদল হৃষ্টপুষ্ট ছেলে মেয়ে নদীর তীরে বালুকা লইয়া খেলা করিতেছিল। উহাদের কোলাহল ধ্বনি কাশিমের কানে সেতারের গুঞ্জনের অপেক্ষাও মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কাশিম ভাবিল—"হায়! যদি সময় থাকতে বিয়ে করতাম তা হ'লে তার গৃহ দিবা-রাত্রি পুত্র-কন্যার কাকলীতে এমনি ভাবে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌তো।" বিবাহের কথায় অমনি তাহার মনে নিদ্রিতা নীহারের মুখখানির উদয় হইল। কাশিম হতাশ স্বরে কহিল—"দূর পাগল, তা কি আর সম্ভব হয়?"

— ৪ —

কাশিম যখন গৃহে ফিরিল নীহার তখন গৃহ-কর্ম্মে নিমগ্না। যথাসম্ভব করুণ স্বরে কাসিম কহিল—"নীহার, কাল তুমি যে বড় তোমার নিজের ঘরে শোও নি!" নীহার কহিল—"কি জানি কাল আমার কেমন ঘুম পেয়েছিল; তোমার ভাত নিয়ে ব'সে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে প'ড়েছি মনে নাই। কাল তুমি যে খেতে এলে না বড়!"

"কাল যেন আমাদের বাড়ীতে ঘুমের পালা এসেছিল, কেমন ক'রে রাতটা কেটেছে কিছুই টের পাইনি। তোমারও বুঝি কাল কিছু খাওয়া হয়নি?"

কাশিমের এইরূপ সদয় সম্ভাষণে নীহার কিছু আশ্চর্য্য মনে করিল। এতদিন সে এখানে আছে, এক দিনও ত এমন ব্যবহার পাই নাই। কাশিমের মুখের পানে সে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কাশিম কহিল—"নীহার ব'স, তোমাকে কিছু বলবার আছে। এতদিন আমি তোমাকে কেবল কষ্টই দিয়ে এসেছি, আজ হ'তে তুমি যাতে সুখী হও—তাই করবো। তোমার বাপের ঋণ শোধ হ'য়ে আমার নিকট তোমার কিছু পাওনা হ'য়েছে। ইচ্ছা হ'লে এখনই নিতে পার।" কাশিমের কথায় ও আচরণে নীহারের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। কাশিম সেই দিন হইতে নীহারকে স্নেহের চোখে দেখিতে লাগিল। নীহার সেই হইতে কাশিমের কাছে প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে সাহস করিতে লাগিল। কাশিম আর এখন সে কাশিম নাই; সে এখন দিব্য বিলাতি জুতা পায়ে দিতে ধরিয়াছে, পাকা চুলে কলপ লাগাইতে ধরিয়াছে, ভাল ভাল কাপড় জামা পরিতে ধরিয়াছে; লোকের সহিত সদয় ব্যবহার ও মিষ্টালাপ আরম্ভ করিয়াছে। কাশিম প্রতিদিন প্রত্যুষে ভ্রমণে বাহির হইত। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খেলনা কিনিয়া দিত। গ্রামের ছেলে মেয়েরা ভয়ে তাহার কাছে ঘেঁসিতে সাহস করিত না বটে—কিন্তু ভিন্ন গ্রামের ছেলে মেয়েরা কাশিমের প্রতীক্ষায়

পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিত। তাহারা কাশিমকে পাইলে ঠিক যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে মনে করিত। কলসী কক্ষে যুবতীর দল যখন গৃহে ফিরিত কাশিমের তখনই নীহারের কথা মনে পড়িত; অমনি তাহার বুকের মধ্যে চড়াৎ করিয়া উঠিত। নীহার কাশিমের হৃদয়ে একাধিপত্য করিতে লাগিল। সে যাহা বলে কাশিম দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই দণ্ডে তাহা পালন করিত। নীহারের অনুরোধে সে কত জনকে ঋণমুক্ত করিয়া দিয়াছে তাহার ঠিক নাই।

— ৫ —

কাশিমের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সংবাদ ক্রমে ক্রমে ফতেমা বিবির কানে পৌঁছিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সে এক দিন কাশিমের গৃহে উপস্থিত হইল। কাশিম তখন একমনে ধূমপানে মগ্ন ছিল। ফতেমা কহিল—"আলি সাহেব, তোমার কি হ'য়েছে বল ত? তোমার রঙ্গ দেখে লোকে যে হেসে হেসে মারা গেল!"

"কেঁদে কেঁদে মরার চেয়ে হেসে মরা কি ভাল নয়?"

"লোকে বলে তুমি নাকি—তুমি নাকি নীহারের কথায় উঠা বসা কর। ও নাকি তোমাকে যাদু ক'রে রেখেছে?"

"নীহারের যেমন রূপ-গুণ, যাদু ক'রবে তাতে আর বিচিত্র কি?"

"আলি বল দেখি এসব কেন? তুমি মেয়েটাকে সাদি ক'রবে নাকি?"

"খোদার মরজি হলে অবশ্যই করব।" "তবে হবে, যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। এই যে তুমি কাশেম আলি—আধ পয়সার মা বাপ, মেয়েটার কথায় জলের মত টাকা বিলাতে যাও! ছি—ছি, বুড়ো বয়সে কি ঢলানই ঢলালে!"

কাশিম কহিল—"ফতেমা, তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না, দৈব কৃপায় আমি আবার যৌবন ফিরে পেয়েছি। আমি এখন আর সে বুড়ো কাশিম নই।"

একটু বিদ্রূপের স্বরে ফতেমা কহিল—"যুবা বল্‌লেই হ'ল কি-না? নিজের দেহটার দিকে ত একবার চেয়ে কথা বলতে হয়!" কাশিম কহিল—"দেহ ত আর আসল মানুষটি নয়, আসল মানুষটি হচ্ছে মন। আমার মন এখন যুবার, তবে কেনই বা আমি নীহারের উপযুক্ত না হব?"

"তুমি নিশ্চয় ক্ষেপেছ, নয় ত তোমাকে ভূতে পেয়েছে। তুমি মনে করলেই নীহার তোমাকে বিয়ে করবে? তুমিও যেমন! ও তোমাকে ভুলিয়ে নিজের মতলব সিদ্ধি করে নিচ্ছে, বিয়ে ও ঠিক মামুদকেই করবে। লাভের মধ্যে তুমি গরীব হয়ে পড়বে। দেখে নিও আমার কথা, আমি যদি

সেখের মেয়ে হই এ অবশ্য ফলবে। বুড়োর জন্য বুড়ী আর ছোঁড়ার জন্য ছুঁড়ি এইত সংসারের নিয়ম।”

এই বলিয়া ফতেমা চলিয়া গেল। তাহার শেষ কথা কয়টী কাশিমের কাণের মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে এতদিন ভাবিবার অবসর পাই নাই। আজ ফতেমার কথায় তাহার মনের মধ্যে চিন্তার উদয় হইল। নীহার কি তবে তাহাকে প্রতারণা করিতেছে? তাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? সে ত নিজের জন্য অথবা মামুদের জন্য কখনও কিছু চাই নাই। না, না, নীহার সত্যই তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু সে কেমন ভালবাসা? দুহিতার না বনিতার? না, আর সন্দেহ বুকে পোষণ করা যায় না। আজই ইহার পরীক্ষা করা আবশ্যক। কাশিম গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

— ৬ —

তখন দিবা অবসান হইয়াছে। নীহার কাশিমের ঘরে আলো দিতে আসিল। তাহাকে দেখিয়া কাশিম কহিল— “নীহার বস ত, তোমার সাথে একটা কথা আছে। দেখ নীহার তুমি এখন বড় সড় হ’য়েছ, এখন আর তোমার আইবুড়ো থাকা ভাল দেখায় না।” নীহার কহিল—“কেন? আমি ত বেশ আছি; বিয়ে আর এজন্মে করবো না।”

কাশিম কহিল—"কেন, তার কারণটা কি?" "কারণ আর কি? আমার খুসী।"

"কই এর আগে তোমার এমন ইচ্ছার কথা ত কখনো শুনি নি! বুঝেছি নীহার, মামুদের উপর অভিমান করে এমন কথা ব'লছ। মামুদ কি আর সে মামুদ আছে? টাকার লোভে সে নাকি ফতেমাকে নিকে করতে স্বীকার করেছে। পাষণ্ড মামুদ এখন চিনেছে শুধু অর্থ। নীহার আমার কথা শুন, তুমি মামুদকে ভুলে যাও।"

"মামুদকে ভুলে যাওয়া যে একেবারে অসম্ভব। তাকে যে মন প্রাণ সব অর্পণ করেছি; আর কি ফিরবার পথ আছে?" "কিন্তু কই মামুদ ত আর তোমাকে চায় না!" "চায় না—তা জানি; সেই জন্যইত চিরকাল কুমারী থাকব সংকল্প ক'রেছি। হায়! মামুদ কেন এমন হ'ল? ঈশ্বর জানেন। সে এত ভাল ছিল, এখন এত মন্দ হয়েছে। তুমি অমন ছিলে এখন এত ভাল হয়েছ! তোমরা দু'জনে ঠিক যেন মনের অদল বদল করেছ। আমার এই লাভ—যদিও প্রিয়তম পতিকে হারিয়েছি—তার বদলে স্নেহময় পিতাকে পেয়েছি।"

"নীহার তুই এ কি বলছিস্? যা বলি মন দিয়ে শোন। দেখ মামুদের দেহটা কিছুই নয়। মনটাই আসল জিনিষ।

তুই কি আমাকে ভালবাসতে পারিস না?" "কেন তোমাকে তো পিতার ন্যায় ভালবাসি, ভক্তি করি।"

"না, না, ও রকম ভালবাসা নয়: তুই কি আমাকে মামুদের মত ভালবাসতে পারিস না?"

নীহার চমকিয়া উঠিল। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। কাশিম কিছু অপ্রতিভের মত হইল। নীহারকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল—"তুইও যেমন, এ আমি তোর সঙ্গে তামাসা করছিলাম। যা তুই—ঘরের কাজ কর্ম্ম দেখগে যা।" নীহার চলিয়া গেল। নীহার অদৃশ্য হইলে কাশিম ভাবিতে লাগিল "তা হ'লে আসল মানুষটা কে? দেহ না মন? মনই যদি আসল মানুষটা হয় তা হ'লে এখন দেহটাই শুধু আমার, মনটা মামুদের। তবে যে নীহার আমাকে ভালবাসতে পারে না? তা হ'লে দেহটাই দেখছি আসল, মনটা কিছু না। তাই বা কি করে বলি? নীহার ত সেই নীহারই আছে, তবে মামুদ এখন তাকে ভালবাসে না কেন? ফতেমাকে ভালবাসে কেন? আর আমিই বা মামুদের মন নিয়ে নীহারকে ভালবাসতে যাব কেন? আচ্ছা—আমি কি ফতেমাকে ভালবাসতে পারি? কখনই না! ফতেমা শীর্ণা, দীনা, কুরূপা পিশাচী। আর নীহার স্ফুটিত-যৌবনা, লাবণ্যময়ী

দেবী! তা হ'লে আমরা হৃদয় দিয়ে ভালবাসি, আর যাকে ভালবাসি সেটী হচ্ছে দেহ। হায় আল্লা! এ কি করলে? আমি বৃদ্ধ, আমার কি আর যুবার হৃদয় শোভা পায়? ফকির তোমার ঔষধ অব্যর্থ, কিন্তু এর ফল মঙ্গলকর নয়। না, আমি মামুদের হৃদয় মামুদকে ফিরিয়ে দিব।" এই স্থির করিয়া কাশিম মামুদকে ডাকিয়া পাঠাইল, মামুদ আসিলে তাহাকে বলিল, "বাপু মামুদ, তুমি তোমার হৃদয় ফিরিয়ে নিয়ে আমার হৃদয় আমাকে দেও। অভাগিনী নীহারের তুমি ভিন্ন আর গতি নাই। আমি আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নীহারকে লিখে দিয়েছি। নীহারকে বিয়ে করলে এ সব তোমারই হবে।"

মামুদ প্রথমে ঘোরতর আপত্তি করিল। পরে রাজী হইল। উভয়ে ফকির প্রদত্ত ঔষধের যাহা অবশিষ্ট ছিল পান করিল। অমনি দু'জনের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইল। কাশিম যে দুর্ব্বৃত্ত ছিল তাহাই হইল। সে মামুদকে গালি দিতে লাগিল, নীহারকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। মামুদ নীহারকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। শুভদিন দেখিয়া উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে কথায় কথায় নীহারের নিকট মামুদ ফকির প্রদত্ত ঔষধের কথা তুলিল। নীহার কিন্তু তাহা সম্পুর্ণ বিশ্বাস করিল না। সে মনে করিল—আত্মদোষ

স্খালনের জন্য মামুদ একটা আজগুবি গল্প রচনা করিয়াছে। কিন্তু যখনই তাহার মনে কাশিমের অসম্ভব পরিবর্ত্তনের কথা উদিত হইত, তখনই ফকিরের কথাটা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা এ কথা মনে করিতে তাহার যেন সাহস হইত না।

(৩)

আদর্শ দম্পতি

বা

কিনু নাপিতের ফাঁসি

বৈশাখ মাস, রাত্রি তখন সাতটার বেশী নয়, সুবল-পুরের সৃষ্টিধর মণ্ডলের বাহির-বাড়ীর প্রাঙ্গণে গ্রামের কৃষকদের প্রাত্যহিক বৈঠক বসিয়াছে। সে কালের সহিত এ-কালের তুলনা করিতে করিতে বৃদ্ধ সৃষ্টিধর কহিল, "সে কাল এক কাল ছিল, সেকালে লোকের যে ভয়-ভক্তি ছিল, এ-কালে আর তা দেখবার জো নাই, এ-কালের ছোড়া-গুলো হয়েছে যেন পরিবারের গোলাম, আর মেয়েগুলো হয়ে উঠেছে যেন তাদের ইষ্টি দেবতা।" শেষের কথাগুলি বিনোদ নামে একজন গো-বেচারী গোচ নিরীহ ভাল মানুষ যুবকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল। সুবলপুরে বিনোদের অসামান্য স্ত্রৈণ বলে একটা দুর্নাম ছিল। বিনোদ কহিল—ঠাকুদ্দা, তা আমার দিকে চেয়ে বলছ যে বড়। আমিই সুধু ধরা পড়েছি, নইলে আমার মত ঘরে ঘরেই। এমন সময় রামতারণ আসিয়া উপস্থিত

হইল রামতারণের আজ আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। সৃষ্টিধর কহিল,— এস এস রামতারণ ভায়া এস, এত দেরী হল যে বড় ? নাত-বৌ ছেড়ে দিচ্ছিল না বুঝি ? রামতারণ কহিল—ওর কথা মুখে এনোনা ঠাকুদ্দা, ওলাওটায় এত লোক মরে শালীর মরণ হয় না।

হাসিয়া সৃষ্টিধর কহিল,—কি ভায়া ! এত উষ্মা কেন ? নাত-বৌর সঙ্গে ঝগড়া করেছ বুঝি ? তাতে এত রাগ কেন ? অমন ত সব্বারই হয়ে থাকে।

রামতারণ কহিল,—না ঠাকুদ্দা তুমি ওকে চেন না। আজ আর কিছুতেই সহ্য হ'ল না, দু'ঘা লাগিয়ে দিয়েছি। সৃষ্টিধর কহিল—কাজটা ভাল করনি ভায়া। এতে লক্ষ্মীর অকৃপা হয়।

রামতারণ কহিল,—যে অলক্ষ্মীর হাতে পড়েছি, লক্ষ্মীর অকৃপা হতে আর বাকি কি আছে বল ? পড়্‌তে যদি ওর হাতে—টেরটা পেতে পরিবার কাকে বলে !

সৃষ্টিধর কহিল—না ভাই আমার আর সে সাধ নাই, তবে বুড়া হয়েছি, একটা কথা বলি শুন। মেয়ে মানুষের গায়ে কখনও হাত তুলতে নাই। এই যে আমাদের কিনু খুড়োর পরিবার, তার মত নাম-করা বজ্জাত ছিল না বল্লেই হয়, অথচ খুড়ো তাকে নিয়ে কেমন দিব্বি ঘর-সংসার করে গেল। কথাটা কি জান ? মেয়ে মানুষকে চালাতে

হলে একটুখানি মুরুব্বিয়ানার দরকার, কিনু নাপিতের গল্প তোমাদের কাছে করেছি কি ? না করে থাকি শুন। সে ভায়া মজার কথা। নিধে ! একবার তামুক খাওয়াত দাদা ! এই বলিয়া গল্প জুড়িয়া দিল।

কিনু নাপিতকে তোমরা কেও দেখনি, কেন না তখন তোমরা হওনি। মজুমদারদের খিড়কির পূর্ব্বলাগা যে জমিটা পতিত আছে, কিনু নাপিতের বাড়ী সেইখানে ছিল, এখনও সেটাকে লোকে নাপিতের ভিটে বলে থাকে। আমরা কিনুকে খুড়ো বলে ডাকতেম। খুড়োর সংসারে থাকবার মধ্যে ছিল এক খুড়ী। খুড়ো বাইরে লোক কিছু মন্দ ছিলনা। সকলের সঙ্গেই হেসে কথা কইত। ছেলেদের সঙ্গে খুড়োর খুবই ভাব ছিল। কাওকে সে গাঙ্গ শালিকের ছানা এনে দিত, কাওকে হয়ত তির ধনুক বা মাছ ধরার ছিপ তৈরী করে দিত। এ সকল গুণ থাকলে কি হয়, খুড়োর একটা মস্ত দোষ ছিল।

সুবলপুরে বাগানের উৎপন্ন জিনিসে পুরা-পুরি ভোগ করবার কারও অধিকার ছিল না—খুড়োর তাতে একটা ভাগ থাকবেই থাক্‌বে। খুড়ো এসব জিনিস এমন সাফাই হাতে সরাত সাধ্য কি কেও তাকে ধরে। পাপকাজ চিরদিন চাপা থাকে না। এর জন্য খুড়োকে একদিন হাতে হাতে ফল পেতে হয়েছিল। তখন জষ্টী

মাস, ঘোষেদের চারা বাগানটা সে-বৎসর হোসেনপুরের মিয়ারা জমা নিয়েছিল। মিয়ারা লোক বড় কঠিন ছিল। দয়ামায়ার কোন ধার ধারত না। খুড়োর দুর্ম্মতি—চুরি করবেন ত মিয়াদের বাগানেই চুরি করতে গেলেন। আমি তখন ধাপার মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছিলাম। খুড়া কতকগুলো আম চুরি করে সেই বাগান হতে বেরুবে অমনি মিয়ারা টের পেয়ে তার পিছন নিতে আরম্ভ করলে। আমি হাত নেড়ে খুড়োকে পালাতে ইসারা করলেম। খুড়ো বেগতিক বুঝে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলে। পালেদের পতিত জমি, ধোপাদের পাটের জমি, হারু সবজীর পটলের জমির উপর দিয়া প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করলে। আর মিয়ারাও ধর শালাকে, মার শালাকে বল্‌তে বল্‌তে পেছন পেছন ছুটতে আরম্ভ করলে। খুড়ো প্রায় সরে পড়েছিল আর কি। কিন্তু বিধাতা পুরুষ নাকি খুড়োর উপর সে দিন ভারি নারাজ। গাজন তলায় একটা বাঁসের মুড়োতে বেধে খুড়ো ত পপাত ধরণীতলে। আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে জমদুতের মত মিয়ারা এসে খুড়োর পিঠে বদাম বদাম করে লাঠি মারতে আরম্ভ করলে। লাঠির গুতো খেয়ে খুড়োত একবারে মরার মত হয়ে পড়ল। মিয়ারা তখন কতকগুলো লতা ছিড়ে এনে, তাই দিয়ে খুড়োকে গাজন গাছে লট্‌কিয়ে দিয়ে গেল। খুড়োর

একটুখানি প্রাণ যা অবশিষ্ট ছিল, গোঁ গোঁ করতে করতে ধড় ছেড়ে বেরিয়ে গেল। খুড়োর ঐ অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ দিবার জন্যে আমি ত খুড়োর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেম। বাড়ীর ভিতর ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না। খুড়ীকে এই দুঃসংবাদ দি' কি করে আমার সেই এক মস্ত ভাবনা হয়ে পড়ল। ভয় হতে লাগল, আমার মুখে এই সংবাদ শুনে খুড়ী আমাকেই দোষী না বলে বসে। স্ত্রী প্রকৃতি এমনি বিচিত্র। তাতে খুড়ী আবার যে সে স্ত্রী-লোক ছিলেন না। বেশ চিক-চিকে আবলুস কাঠের মত রঙের নাদুষ-নুদুষ গোছের মানুষটী। দৈর্ঘের চেয়ে আড়ে বেশী সুমুখের দাঁত দুটি যেন ঝগড়া করে পৃথক হয়ে রয়েছে। খুড়ীর মুখখানি কিবা দিন কিবা রাত্র কোন সময়ের জন্য বন্ধ থাকতে দেখা যেতো না। খুড়োর বাড়ীতে যেন অষ্ট প্রহরের জন্য শম্ভু নিশম্ভুর যুদ্ধ লেগেই আছে। ওদের স্ত্রী পুরুষের ঝগড়া যদি তোমরা কোন দিন দেখতে তা'হলে তোমরা নিশ্চিত বলতে, খুড়োর মৃত্যুতে খুড়ীর দুঃখ করবার কোন কিছু ছিল না; বেশ ত খুড়ীর মস্ত একটা বালাই গেল। নাহে তা'না। লোক-রহস্য তোমরা কিছুই বুঝনা।

আমিত দরজায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে খুড়ীর পানে চেয়ে আছি। খুড়ী তখন আঙনেতে বসে বাসন মাজছিল।

তোমরা মনে করছ খুড়ী বুঝি মুখ বুঁজে একমনে কাজ করছিল, নাহে তানা। খুড়ী বাসন মাজে আর বলে—"কোথায় গেল, সেই হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া মিন্সে? বেলা যে গড়িয়ে গেল তবু মুখ পোড়ার আসার নামটি নাই, আমি তার পিণ্ডি রেঁধে বসে আছি, কখন এসে গিলবেন তার ঠিক নাই। আসুক আগে ঝেঁটিয়ে বিষ ভেঙ্গে দিব।" আমার দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায়, ধপাস করে ঘটিটা মাটিতে ফেলে হাত মুছতে মুছতে নিকটে এসে এমনি ভাবে আলাপ জুড়ে দিলে যেন আমাদের কত দিন ধরেই কথা বার্ত্তা হচ্ছে।

খুড়ী বল্লে—"দেখ ভাশুর পো, মেয়ে জন্ম না ছার জন্ম। যে দু'দিন বাপের বাড়ী থাকা সেই দু'দিন যা সুখ ভোগ করা। বিয়ে হওয়া আর জন্মবাঁদি হওয়া। শতেক পাপ না করলে মেয়ে জন্ম হয় না। দিন নাই, রাত নাই সুধু খাট, খাট, খাট। বাসন মাজ, জল তোল, ধান সিদ্ধ কর, এত বড় গেরস্তালীর উনকুড়ি চৌষট্টি কর। খেটে খেটে দেখ-দেখি ভাশুর পো আমার কি দশা হয়েছে। আমার অমন কাঁচা সোনার বরণ একবারে কালী হয়ে গিয়েছে।" এই বলতে বলতে খুড়ী গা হতে কাপড় ফেলে দিয়ে তাঁর দেহটা দেখালেন। "আমাকে দেখলে কি আর কেও বদরগাছীর বিশ্বনাথ পরামাণিকের মেয়ে বলে চিনতে পারে? ঐ

হতচ্ছাড়া হাড়হাভাতে মুখ-পোড়ার জন্মই ত আমার এই দশা। বাবা গো! তোমার বড় আদরের চন্দুরীর কি দশা হয়েছে একবার দেখে যাও গো" বলে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। আমি আস্তে আস্তে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বল্লেম "খুড়ী, আর কেঁদোনা, খুড়ো আর তোমাকে দগ্ধাতে আসবে না।"

খুড়ী বল্লে,—ও কথা ভুলেও মুখে এনোনা ভাশুর পো, ও মুখপোড়া যতদিন বাঁচবে আমাকে দগ্ধাতে একদিনও ভুলবে না। ঘরে এলেন ত বকুনীর বিরাম নাই। বাইরে যদি গেলেন তাতেও কি নিশ্চিন্ত হবার জো আছে? এই দেখনা আমি কোন যুগে রেঁধে বেড়ে বসে আছি মিনসের আসার কথাটি নাই। গেলেন যে কোন চুলোয় তা পর্য্যন্ত টের পাবার উপায় নাই, মরণ হয় ত বাঁচি।

আমি বল্লেম,—"খুড়ী তোমার দুঃদ্দিনের বুঝি এত দিনে অবসান হল। খুড়ো আর আসবে না।"

খুড়ী বল্লে—"কি! পেরবাসে গিয়েছেন! হ্যাঁ! আমাকে এত অপমান, যাবার আগে একবার বলেও গেল না। আমি ওর জন্যে পিণ্ডি রেঁধে মরছি, আর উনি গেলেন পেরবাসে। ভুলো কুকুরটার চেয়েও আমাকে তুচ্ছ মনে করলে?" ভুলোর নাম শুনে একটা কুকুর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে খুড়ীর কাছে এসে কোঁ, কোঁ করতে লাগল।

খুড়ী বল্লে—"তা যাক যেখানে তার খুসী, এর ফল কি হয়, তোমরা দেখতেই পাবে। মানুষটির স্বভাব ত জানি, কবে কার কি চুরি করতে যাবে আর ধরা পড়ে ফাঁসীতে ঝুলতে হবে। তুমি দেখে নিয়ো ভাশুর পো আমার কথা যদি মিথ্যে হয়।" আমি বল্লেম—খুড়ী খুড়োকে যদি দেখ্‌বে এস আমার সঙ্গে, বেশী দূর নয় গাজন তলায় গেলেই হবে।

খুড়ী আমার কথায় রেগে বল্লে—ওরে হতভাগা ছোঁড়া ঠাট্টা করবার আর যায়গা পেলি না বুঝি, তাই এলি আমার সঙ্গে লাগতে। আমি কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্লেম—খুড়ী, খুড়ো আমার নেই গো! জন্মের মত চলে গিয়েছে। গাজন-তলায় খুড়োকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিয়েছে। খুড়ী বল্লে—"তবে কার কি চুরী করতে গিয়ে থাকবে বুঝি।" আমি বল্লেম—"হুঁ"।

অনেকক্ষণ ধরে খুড়ীর মুখে কোন কথা বের হল না। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ঠোঁট দু'খানা কাঁপতে আরম্ভ করল। তারপর ধপাস করে মাটিতে পড়ে গিয়ে "কি হল গো! কোথায় যাব গো" বলে চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিলে। খুড়ীর কান্না শুনে দুই এক করে পাড়া-প্রতিবেশী জুটতে লাগল। খুড়ী বুক চাপড়ায় আর কাঁদে আর বলে—"হায় হায় কি সর্ব্বনাশ হল গো।

সে আমার কি মানুষই ছিল গো ! কি আদরই করত গো। আজ সাত বছর ঘর করছি একদিনের জন্যও কথান্তর হয় নি। ওগো তুমি এসো গো, তোমার অভাবে এ বাড়ীতে আমি থাকব কি করে গো। ও বাবা গো আমার কি হল গো !” ক্রমে খুড়ীর কান্নার সুর নরম হয়ে আসতে লাগল। তখন আঁচল দিয়ে চোক রগড়াতে রগড়াতে খুড়োর যত কিছু গুণ একে একে বর্ণনা করতে আরম্ভ করল। খুড়ী যদি একটু সান্ত্বনা পায় তাই ভেবে আমি বল্লেম—খুড়ো আমার দ্যাবতা ছিল, কলিকালে অমন মানুষ কি আর জন্মায় ! এত লোকের সম্বন্ধে এত কথা শুনতে পাই কই বলুক দিখি কেও খুড়োর বিরুদ্ধে কোন কথা ?” মনে করলেম আমার এই কথায় খুড়ী মনে মনে খুসী হবে, দেখি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। খুড়ী বল্লে—না বলতে আবার পারে না। আমার চেয়ে তোমরা ওকে ভাল জান কি না ? পরের সামগ্রীতে হাত দিত না কেমন ? তা' হলে কলুদের মর্ত্তমান কলার কাঁদিটা কে নিলে ? সাত বছর ঘর করছি কই পয়সা দিয়ে কোন জিনিস কিনতে দেখলাম না ত কোনদিন। বড় সুখেই রেখেছিল, আমার কপাল মন্দ তাই এমন হ'ল।

আমি বল্লেম—যা হবার তা ত হয়েছে, এখন খুড়োর পরকালের কাজ করতে হয় ত। এই বলে খুড়ীকে সঙ্গে

নিয়ে গাজন তলায় উপস্থিত। সেখানে দেখি, খুড়োকে গাছ হতে নামান হয়েছে। খুড়া ছুটে গিয়ে বল্লে "ওরে গদাই আস্তে আস্তে নিয়ে আয়, দেখিস্ যেন না লাগে। হরে, গদাই, বিশু, নিতাই ধরাধরি করে খুড়োকে মাটিতে শুইয়ে দিলে। ছোড়াগুলোর কি কান্না, মেয়েরা চারিধার ঘিরে খুড়োকে দেখতে লাগল। খুড়ী খুড়োর পায়ের দিকে গিয়ে বসল। মেয়ে-মিন্‌সে, ছেলে-বুড়োতে মিলে বিপরীত একরকম কান্না জুড়ে দিলে। কান্নার শব্দতেই হোক্, কি অন্য কোন কারণেই হোক্ খুড়ো ধীরে ধীরে মাথা তুলে চারিদিক একবার দেখে নিয়ে বললে, "বাঃ! বাঃ! তোমরা ত তোফা বেসুরো গান ধরে দিয়েছ দেখছি।" মরা মানুষ কথা কয় দেখে লোকদের মধ্যে হ'তে একটা হৈ হৈ শব্দ উঠতে লাগল। মেয়েগুলো আর ছেলের দল ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে আরম্ভ করল। অনেক্ষণ কারও মুখে কোন কথা বের হল না। অবশেষে খুড়ী বল্লে, "তবেরে মুখপোড়া, তোর এই কাজ, চুরী করে গলায় ফাঁস! ওমা কি ঘেন্নার কথা গো! আমি কত পাপ করেছিলাম তাই এই দেখতে হল।" খুড়ো আস্তে আস্তে উঠে বসল। তার মুখ দেখলে মনে হয় না বিশেষ কিছু একটা হয়েছে। আমার দিকে চেয়ে বল্লে হাঁহে! এ মাগী আবার কে বলত ঘ্যানর ঘ্যানর করে বকতে

লেগেছে ? এমনি ভাব করে খুড়ো এ কথা বল্লে যেন খুড়ীকে জন্মেও কখন চোখে দেখেনি। খুড়ী বেগতিক দেখে আস্তে আস্তে খুড়োর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বল্লে "আমাকে চিনতে পারছ না, আমি যে নারাণের মাসী তোমার বড় সাধের চন্দুরী।"

খুড়ো আমার দিকে চেয়ে একটু মুচ্‌কী হেসে বল্লে—"কে-ও, কিনুর বৌ, তা আমার কাছে কেন বাছা! হতভাগী কিনুর বিধবা স্ত্রী, তোর এই বয়সেই হাতের নোয়া খুলতে হল।"

খুড়ী মুখে যা এল, তাই বলে খুড়োকে গাল দিতে লাগল। খুড়ী যেই একটু থামে অমনি খুড়ো বলে উঠে "হা হতভাগী কিনুর স্ত্রী! তোর এই বয়সেই সব সুখ শেষ হল।"

খুড়ী তখন সুর নরম করে বল্লে "ওগো, তুমি সব ভুলে গেলে নাকি গো? তুমি যে আমার সোয়ামী।" খুড়ো বল্লে "আমি কেন তোর স্বামি হতে যাব—তোর স্বামী ত কিনু নাপিত, মিয়ারা তাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে মেরে ফেলেছে যে।"

খুড়ী বল্লে "ও আবার কি রঙ্গ—যাও বালাই, আমার অমন বাজার মত সোয়ামী বেঁচে থাক।" এই বলে খুড়োর হাত চেপে ধরল। খুড়ো খুড়ীর হাত ছুড়ে ফেলে দিয়ে "করছিস কি? লোকে বলবে কি? বিধবার কি

পরপুরুষের হাতে হাত দিতে আছে? ছি!" এই বলে খুড়ো উঠে দাঁড়াল। আমরা সবাই ব্যাপার দেখে হাসতে আরম্ভ করে দিলাম।

খুড়ো বল্লে—আঃ বাঁচলেম। এত দিনে ঘাড়ের বোঝা নামল যাহোক। এই বলে খুড়ো যেতে আরম্ভ করল, খুড়ীও তার পিছন পিছন যায় আর বলে—"ওগো তোমার দু'খানি পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও যেওনা। তোমার লেগে তেঁতুল দিয়ে মাছ রেঁধে রেখেছি, চল, খাবে এস। যাও যদি তার আগে আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলে যাও।" খুড়োর যতই দোষ থাক, তার মনটা ছিল ভারি নরম, মেয়ে মানুষেব চোখের জল একেবারেই সহ্য করতে পারত না। খুড়ীর কাকুতি মিনতিতে খুড়োকে অবশেষে বাড়ী যেতে হল। বাড়ীর দরজায় পা দিয়ে খুড়ো বল্লে—দেখ বৌ আমি ত মরেই ছিলাম, দৈব কৃপায় যদি বাঁচলেম, তুই আমার ফাঁসীর কথা তুলে যদি ঝগড়া করিস, তা'হলে বাড়ী ছেড়ে তখনই চলে যাব। তুই আগে তিন সত্যি কর, কখনও আমার ফাঁসির কথা তুলবি না। যদি তা না করিস, তা'হলে এই পর্য্যন্ত, আর এক পাও এগোবনা বলছি।

খুড়ী বল্লে—"ওগো কখনও বলব না।"

খুড়ো বল্লে—"তিন সত্যি কর তা'হলে," "ওগো তুলব না, তুলব না, ফাঁসীর কথা কোন দিনও তুলব না। মাথার উপর

চন্দর, সুর্য্যি আছেন, তা যদি করি, আমি বিশ্বনাথ পরামানিকের মেয়েই নই।

এই কথার পর দু'জনের মধ্যে বেশ মিল হয়ে গেল। খুড়ী পিড়ে পেতে খুড়োকে বসালে, গেলাসে করে জল দিলে, এটা খাও, ওটা খাও, মাছ কেমন হয়েছে এই বলে কত আদর করতে লাগলে।

আর একদিনের কথা বলি শুন। সন্ধ্যার সময় মাঠ হ'তে ফিরছি—খুড়োর বাড়ীতে খুড়োতে আর খুড়ীতে তুমুল ঝগড়া লেগে গিয়েছে। খুড়ো বলছে—"আমার সাত জন্মের পাপ তাই তোকে বিয়ে করে ঘরে এনেছি। এমন ছোটলোকের মেয়েও হয়। তোর সঙ্গে বকাবকি করতে যে সময় নষ্ট হয়, যদি কাজ করতেম অবস্থা ফিরে যেত এতদিন।"

খুড়ী বল্লে—"থাম্ থাম্ ঢের হয়েছে, উনি কাজ করবেন আমি আবার তাই চোক্ষে দেখব। কথাটা বলতে জিবটা আড়িয়ে গেলনা কেন যে তাই ভাবছি। কাজ কাকে বলে জানিস্ তুই কখনও।"

খুড়ো বল্লে—"চুপ কর্ মাগী, মুখ সামলে কথা কস্। বড় যে বাপ ভাইয়ের গরব করিস্, তোর কোন বাপ ভাই তিন সন্ধ্যে এমন করে ভাতের রাশ যোগাত বলত ?"

বাপ ভাইয়ের কথা তুলায় খুড়ীর মুখ রাগে রাঙা হয়ে উঠল। খুড়ী বল্লে—"কি এত বড় কথা! ছোট মুখে

বড় কথা! তোর ভাগ্যি ভাল তাই বদরগাছির বিশ্বনাথ পরামাণিক তোকে মেয়ে দিয়েছিল। তোদের জানত কে? চিনত কে? আমা হতেই তোদের কুল উজ্জ্বল হয়েছে জানিস্?” খুড়ো বল্লে—“তা হোক্ কুল উজ্জ্বল, বিয়ের সময় কিছু যৌতুক দিলে তবে বোঝা যেতো।”

খুড়ী বল্লে—“তা না দিক্ তোর মুখে ওকথা শোভা পায় না। তুই আমাকে এমন কি রাজরাণীর হালে রেখেছিস বল ত? এই সাত বছর ধরে বাসন মেজে মেজে আর জল তুলে তুলে আমার হাতে কড়া পড়ে গেল। বলি ও হতভাগা মিন্‌সে যদি চোখের মাথা না খেয়ে থাকিস্ দেখ দেখ একবার।” এই বলে হাত দু'খানা খুড়োর চোখের সম্মুখে ধর্‌লে আর বল্লে “আর যাই বল আমার বাপ ভাইয়ের কথা তুলিস না বলছি। তারা ত তোর মত চুরী করে ফাঁ—”বলে হঠাৎ জিভ্ কেটে কথা বন্ধ করলে।

খুড়ো বল্লে—“বটে বটে এই বুঝি তোর তিন সত্যি করা, এই থাকল ঘর বাড়ী, আমি চল্লেম এখান থেকে।”

খুড়োর কথায় খুড়ীর রাগ আরও বেড়ে গেল। ঘরের কলুঙ্গিতে চুল বাঁধার দড়ি ছিল, তাই এনে নিজের গলায় দিয়ে ডানে বায়ে দোলে আর বলে “ও পোড়ারমুখো মিনসে দেখ্ দেখ্ মিয়ারা তোর কি নাকাল করেছিল,

ও ছোটলোক কোথাকার দেখ্ দেখ্ তোর কি দশা হয়েছিল।” খুড়ীর এই রঙ্গ দেখে আমি ত অবাক্। আমার হাসি রাখা অসম্ভব হয়ে প'ড়ল। আমার হাসির শব্দ শুনে খুড়ো আমার পানে চেয়ে হেসে বল্লে “এ মাগী আমার উপরে যায় দেখছি, এর সঙ্গে পারি আমার কি সাধ্যি? দেখ সৃষ্টি ভাইপো মেয়ে মানুষ যা বলে তাতে হাঁ দিয়ে যেয়ো। দেখলে ত তোমার খুড়ীর কাণ্ডখানা।” তারপর খুড়ীর দিকে চেয়ে বল্লে—“ও কি করছিস্ পাগলি, আয় আয় কাছে আয়। কাল হাট-বার, তোর জন্য কি আনব বল ত? এই বলে খুড়ীর হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিল।

“ও কে, ছিষ্টি ভাসুরপো নাকি? এক পাশে চোরের মত দাঁড়িয়ে আছ যে বড়? বলি ভাসুরপো, আর কতদিন বিয়ে না করে আইবুড়ো থাকবে বলত? একটা ভাল দেখে লক্ষ্মীর মত বৌ আন না ঘরে! এই দেখ না তোমার খুড়োকে, সাত বছর আমাকে ঘরে এনেছেন। এনে ভাল হয়েছে না মন্দ হয়েছে? বলুক ত কেও আমাদের দু'জনের মধ্যে একদিনের জন্যে গরমিল হয়েছে। হয় কি নয় বল্‌না কেন মিন্‌সে?” এই বলে খুড়োর গালে একটা ঠোনা মারলে।

(৪)

যমজ ভাই

গ্রামের বাহিরে সুতোয়া নদীর তীরে স্বামী জ্ঞানানন্দের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। নদী হইতে আশ্রমটী দেখিতে ঠিক যেন পটে আঁকা ছবিখানির মত। স্বামীজি দেশ বিদেশ হইতে কত রকমের ফল ফুলের গাছ আনিয়া এখানে রোপণ করিয়াছেন তাহার স্থিরতা নাই। ইহারা এখন ফল-ফুলে সুশোভিত। কত বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র কণ্ঠের পাখীর কূজনে আশ্রমটী নিয়ত কালের জন্য মুখরিত। আশ্রমের মধ্যস্থানটীতে ছাত্রদের থাকিবার স্থান। কত দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্রের দল আসিয়া এখানে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য-পালন ও বিদ্যার্জ্জন করিত। জনাকীর্ণ নগরী শিক্ষার উপযুক্ত স্থান নয়, স্বামীজির এইরূপ বিশ্বাস। এই জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি এই আশ্রমটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচারী শিষ্যের যে প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এখানকার ব্যবস্থা অনেকটা সেইরূপ।

আমি ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া এখানে আসি। আমি যে সময় আশ্রমে আসি—স্বামীজি তখন বৃদ্ধ

হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার মনের উৎসাহ পূর্ব্বেরই মত ছিল। আশ্রমটীতে দেখিবার মত অনেক জিনিষ। স্বামীজি সঙ্গে করিয়া একে একে আমাকে সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন।

তখন আর বেলা ছিল না। সায়াহ্নের ম্লান রবি নদীর ওপারে আম্রকুঞ্জের মধ্যে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছিল। মাঠ হইতে রাখাল বালকেরা ঘরে ফিরিতেছিল ; তাহাদের মেঠো গানের সুরের সহিত গরুর গলার শব্দ মিশিয়া দূর হইতে কানে প্রবেশ করিতেছিল। পাখীরা যে যার নীড়ে ফিরিয়াছে। তাহাদের দিনান্তের কিচির মিচির শব্দ এই মাত্র থামিয়া গিয়াছে। মৃদু পবন হিল্লোলে বৃক্ষ বল্লরীর মর্ম্মর শব্দ খরস্রোতা সুভোয়ার কুল কুল শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্বপ্নে শোনা গানের সুরের মত কানে আসিয়া পৌঁছিতে-ছিল। একটা নিবিড় শান্তি যেন আশ্রমটীকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিতেছিল।

এ সময় ঘরে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া নদীর বাঁধা ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখি স্বামীজি ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার দৃষ্টি অদূরস্থিত একটী

মর্ম্মর স্তম্ভের প্রতি স্থির হইয়া আছে। স্তম্ভটী শ্বেত পাথরের—চতুষ্কোন—খুব উঁচু নয়—দেখিতে সুন্দর বলা যায়। ইহার একদিকে দু'টি বালকের মূর্ত্তি খোদিত। ছেলে দু'টি পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া যেন সুখে নিদ্রা যাইতেছে। স্তম্ভটীর চারিধারে অনেকখানি স্থান লইয়া সবুজ ঘাসের জমি।

স্বামীজি তাঁহারই পাশে আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি বসিলে বৃদ্ধ কহিলেন—"ঐ যে স্তম্ভটী দেখিতেছ,—দুইটী শিরীষপেলব শিশুর স্মৃতি চিরদিনের জন্য যেন এখানে ঘুমাইয়া আছে। তাহারা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, আমারই মত তোমার চিত্ত তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না,—তাহারা এমনই ছিল। তাহাদের ভাল না বাসিয়া থাকিবার জোটি ছিল না। ওরা যে দুটো দস্যু! কোথা হইতে আসিয়া মনের তাবত ধন দৌলত কাড়িয়া না লইয়া ছাড়িয়া দিত না।

সে আজ ছয় বৎসরের কথা—তাহারা প্রথম এই আশ্রমটীতে আসে। তখন আমার বয়স হইয়াছে, সংসারের হাটে কেনা বেচা শেষ করিয়া ভব-সাগরে পাড়ি দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। উপযুক্ত লোকের হাতে আশ্রমের ভার অর্পণ করিয়া আমি শেষের সে দিন স্মরণ

করিতেছিলাম, এমন সময় কোথা হইতে তাহারা আসিয়া আমার সমস্ত সংকল্প উল্টাইয়া দিল।

একদিন সকালে নিজের কুটীরে বসিয়া আছি, এমন সময় একটি ছাত্র আসিয়া সংবাদ দিল—একটি রমণী আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন। রমণী একা আসেন নাই—সঙ্গে একটী লোক ও দুইটী শিশু আছে।

তাহাদের এখানে আসিতে বলিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—আমাকে তাহাদের কিসের প্রয়োজন?

কিছুক্ষণের মধ্যে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম রমণী সুন্দরী এবং তাঁহার বয়ক্রম খুব বেশী নয়। বেশ ভূষায় তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত বংশের বলিয়া মনে হইল। সঙ্গের লোকটীর নিকট ইহার পরিচয় পাইলাম। ইহার স্বামী আমার বিশেষ পরিচিত। আমি যখন হরিদ্বারে ছিলাম—তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তিনি আমাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। এই আশ্রমের সাহায্যকল্পে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। অনেক দিন তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই—কেন পাই নাই সেই দিন তাহা জানিতে পারিলাম।

রমণী ভক্তিভরে আমাকে প্রণাম করিয়া নিজমুখে তাঁহার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন। রমণী কহিলেন—তাহার স্বামী মৃত্যুকালে তাহাকে দুইটী আদেশ

দিয়া যান। প্রথম—তাঁহার চিররুগ্না শাশুড়ীর সেবা, অন্যটী—তাঁহাদের এই ছেলে দুটিকে আমার কাছে রাখা। স্বামীর প্রথম আদেশ দেবতার আজ্ঞা মনে করিয়া কায়-মনোবাক্যে পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার দ্বিতীয় আদেশ যাহাতে পালিত হয় সেই জন্য ছেলে দুটিকে লইয়া স্বয়ং এখানে রাখিতে আসিয়াছেন।

একবার মনে হইল রমণীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করি। আমি বুড়া মানুষ, কবে আছি—কবে নাই; আমার কি এই গুরুভার স্কন্ধে করা উচিত? কিন্তু রমণীর সকরুণ সাশ্রু-নয়ন দু'টি আমার বৃদ্ধ-হৃদয় দ্রব করিয়া দিল। রমণীকে হতাশ করা আমার সাধ্যে কুলাইল না। আমি স্বীকৃত হইলাম। ছেলে দু'টি আমার দুই কাঁধের উপর হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জানি না কোন মন্ত্রবলে তাহারা তখনই আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল। হায় বৃদ্ধ! তুই এখনও বাঁচিয়া আছিস্—আর সেই দেব-শিশু দু'টী—তারা আজ কোথায় গেল?

ছেলে দু'টির জননী তাহার পরদিন চলিয়া গেলেন; তাহারা আমার কাছে রহিয়া গেল।

বড় সুন্দর এই ছেলে দু'টি! তাহাদের সমস্তই সুন্দর—কথা সুন্দর, ব্যবহার সুন্দর। তাহারা যমজ ছিল। এক বৃন্তে—একই সময়ে ফোটা দু'টি গোলাপ ফুলের মত,

তাহারা সকল বিষয়েই ঠিক এক রকম ছিল। তাহাদের বেশভূষা এক, চোখ, ভূরু, চুল, কথা একেবারে অভিন্ন। একই ভালবাসায় তাহারা যেন আমার শুষ্ক হৃদয় মুঞ্জরিত করিয়া তুলিল। দিনের মধ্যে কতবার তাহারা ছুটিয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিত, আমার এই বিশুষ্ক কঠিন গণ্ডে তাহাদের নধর গাল দু'টি স্থাপন করিত। আমিও তাহাদের বুকে চাপিয়া ধরিয়া যেন স্বর্গের সুখ অনুভব করিতাম। এমনি করিয়া সেই যমজ শিশু দু'টি আমার হৃদয়ের মরা গাঙে আর একবার ভাদরের বান ডাকিয়া আনিল।

প্রথম প্রথম ভাই দু'টিকে লইয়া আমাকে কিছু গোলে পড়িতে হইত। কে হর, কে হরি, আমি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতাম না। প্রায়ই ভুল করিয়া বসিতাম, ইহাতে তাহারা বেশ আমোদ উপভোগ করিত; এবং আমাকেও অপ্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে অনেক সময় হরের প্রাপ্য হরি লইত, আর হরিকে যাহা দিব মনে করিতাম হর আসিয়া লইয়া পলাইত। কিন্তু এক বিষয়ে তাহারা আমাকে কোন দিনই ঠকাইতে পারে নাই। আমার ভালবাসার ভাগ উহাদের দুইজনের প্রতিই সমান পড়িত। একজনকে বেশী, আর একজনকে কম হইবার জোটি ছিল না।

দুই চারিদিনের মধ্যে উহাদের মধ্যে কে হর, কে হরি, চিনিতে আর গোল হইত না। প্রথম দৃষ্টিতে এই যমজ

ভাই দু'টির মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝিতে পারি নাই সত্য—কিন্তু পরে আমার আর তাহা মনে হইত না। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও নিতান্ত অল্প ছিল না। হরির কালো কোঁকড়া চুল সামান্য আর একটু কম কালো হইলে হরের চুল হইতে পারিত। চোখ দু'টি উভয়েরই ভাসা ভাসা—কিন্তু হরির তারা দু'টি যেন হরের অপেক্ষা একটু বেশী কালো। হরের চোখের পানে চাহিলেই যেন মনে হয়—উহার মধ্যে চির-হাস্য লুক্কাইত আছে, আর হরির চোখ দু'টি—ওরা যেন অশ্রুরই উপযুক্ত বাসের স্থান। তাদের গলার স্বরও ঠিক এক ছিল না। বাঁশীতে জোরে অথবা আস্তে ফুঁ দিলে যেমন বিভিন্ন সুর বাহির হয়—উহাদের দুই ভায়ের গলার স্বরের মধ্যে কতকটা সেইরূপ পার্থক্য ছিল। তাহাদের হাসিও যেন ঠিক এক ছিল না। হর যখন হাসিত—সমস্ত আশ্রমটী মুখরিত হইয়া উঠিত। হরির হাসি, যেখানে হাসিত সেই স্থানটুকুর মধ্যেই লীন হইয়া যাইত। অল্পদিনের মধ্যে উহাদের পায়ের শব্দ শুনিয়া কে হর কে হরি আমার চিনিতে গোল হইত না। হরির চলার মধ্যে কেমন একটা সলজ্জ ভয়ের ভাব প্রকাশ পাইত, আর হর যখন চলিত—তাহার চলার মধ্যে একটা অদম্য সাহস ও নৃত্যের তাল প্রকাশ পাইত।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বামীজি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি

নীরবে আপনার মধ্যে শিশু দু'টির পবিত্র স্মৃতির অনুধ্যান করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু দু'টি সম্মুখের পাষাণ গাত্রে মুদ্রিত শিশু দু'টির দিকে যেন নিষ্পন্দভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকার পর তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—"এই প্রিয় দর্শন যমজ শিশু দু'টি অল্প দিনের মধ্যেই এ আশ্রমের সকলের মন হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল ।

গ্রাম্য বধূরা ইহাদের দেখিবার জন্য এই ঘাটে জল লইতে আসা ধরিল। কৃষকেরা মাঠ হইতে ফিরিবার সময় ইহাদের একবার না দেখিয়া বাড়ী ফিরিতে পারিত না। পথিকেরা দৈববশে যদি একবার ইহাদের দেখিতে পাইত, পথের কথা, চলার কথা ভুলিয়া গিয়া কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। দেখিতে দেখিতে উহারা এই আশ্রমটীকে নিজের বাড়ীর মত মনে করিতে লাগিল। উহারা পালাক্রমে উহাদের মাকে পত্র দিত, কিন্তু সেই সব পত্রে দেশে নিজের বাড়ীতে যাইবার জন্য কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিত না। তাহাদের জননীর একখানা ফটো তাহাদের সঙ্গে ছিল, রাত্রে শোবার সময় দুই ভাই গলা জড়াইয়া ধরিয়া সেই ছবিখানি একবার করিয়া দেখিত। তাহারা যত দিন এখানে ছিল—একদিনের জন্যও এ নিয়মের অন্যথা হইতে দেখি নাই।"

"একদিন রাত্রে শুইতে যাইবার সময় হর বলিল তাহার গলার মধ্যে কেমন বেদনা করিতেছে, ঢোক গিলিতে কষ্ট হইতেছে। তাহারা দু'টি ভাই এক শয্যায় শয়ন করিত; আমি তাহাদের পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, কিছু-ক্ষণ পর গিয়া দেখি—তাহারা এক বিছানায় পরস্পর গলা জড়াইয়া ধরিয়া গভীর নিদ্রা যাইতেছে। একবার মনে হইল---উহাদের ডাকিয়া পৃথক বিছানায় শুইতে বলি, কিন্তু কিছুতেই সাহস হইল না। এই গভীর ভ্রাতৃস্নেহের দৃঢ় আলিঙ্গন ভাঙিতে পারিলাম না। হরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখি তাহার গাল দুটি রাঙা হইয়াছে, ঘুমের ঘোরে থাকিয়া থাকিয়া সে যেন চমকিয়া উঠিতেছে। একটা কঠিন রোগ যে তাহার দেহটাকে আশ্রয় করিয়াছে সে সম্বন্ধে সে সময় আমার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। অত্যন্ত চিন্তাকুলভাবে তাহাদের সেই অবস্থায় রাখিয়া আমি নিজের ঘরে গিয়া বসিয়া রহিলাম। সকালে সর্ব্ব প্রথমেই তাহাদের কাছে গেলাম, দেখিলাম দু'টী ভাই এক বিছানা-তেই শুইয়া আছে। কিন্তু রাত্রির মত পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধ অবস্থায় নাই। হরি হরের কাছ হইতে একটু সরিয়া হরের বুকের উপর একখানা হাত রাখিয়া সাশ্রুনয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। আমাকে আসিতে দেখিয়া তাড়া-তাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। হরের কিন্তু উঠিবার শক্তি

ছিল না। সে উদ্বিগ্নভাবে আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া চক্ষু মুদিত করিল। কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায় কহিল—তাহার গলার ব্যথা বাড়িয়াছে—নিশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। আমি তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম—তাহার গা অত্যন্ত গরম, নাড়ি দেখিলাম—অত্যন্ত দ্রুত বহিতেছে। সন্ধ্যার সময় জ্বরও বাড়িল, তাহার সঙ্গে বিকারের লক্ষণ দেখা দিল। রোগটা যে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহাকে দেখিলে সে বিষয়ে আর কোন সংশয়ই থাকে না। এক রাত্রের ও এক দিনের রোগের তাড়নায় তাহার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! হর ত চুপ করিয়া থাকিবার ছেলে নয়। পড়ার সময়টুকু বাদ দিলে সে হয় নাচিয়া নয় গান গাহিয়া কি দুষ্টামি করিয়া কাটাইবে। কোথায় গেল তার সে সব নাচ গান! তাহার হাস্যোজ্জ্বল চোখ দু'টি অশ্রুভারে নত হইয়া পড়িয়াছে, তার কণ্ঠ হইতে বেদনা-কাতর ধ্বনি নিঃসরণ হইতেছে। তার সদা উল্লাস-ভরা মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে।"

"হরি হরের অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। তাহাদের বয়সের ছেলেদের সাধারণতঃ মৃত্যুর কথা বড় একটা মনে আসে না। হরির প্রকৃতি কিন্তু অন্যরূপ ছিল। আমাকে দেখিয়া সে একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। সে কহিল তাহাদের এক দাদা ছিল, সে এই রকম গলার ব্যথা

ও জ্বর হইয়া মারা গিয়াছিল, সেই হইতে তাহাদের মা গলার ব্যাথাকে বড় ভয় করেন। তারপর আমার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে একবার চাহিয়া কহিল—'তবে কি হর আর বাঁচবে না?' আমি এই প্রিয়দর্শন শিশুটির দিকে একবার চাহিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলাম। দেখিলাম তাহার গাও অসম্ভব গরম হইয়াছে। তাহার হৃৎপিণ্ডটা জোরে উঠা নামা করিতেছে। আমি তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার নিজের বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। তাহার সমস্ত দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল। সে দিন ঐ ভাবেই কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিনে হরিও প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। সেও যেন ধীরে ধীরে তাহার ভ্রাতার পথ অনুসরণ করিতেছে মনে হইতে লাগিল।"

"কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি এই ছেলে দু'টির! সুস্থ অবস্থায় তাহাদের কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গি আমার মন হরণ করিত; বিকার অবস্থাতেও তাহাদের ব্যবহার ও আচরণের বেশী পরিবর্ত্তন হইয়াছিল না। রোগ যতই প্রবল হইতে লাগিল—মরণের ভয় তাহাদের মন হইতে ততই দূর হইতে লাগিল। বিকারের অবস্থায় দুই ভাই পরস্পর যত প্রকারের যে আলাপ করিত তাহার স্থিরতা ছিল না। কখনও তাহাদের দেশের কথা বলিত, কখনও বা তাহাদের

দাসদাসীর নাম করিয়া ডাকিত, কখনও বা গ্রামের লোকদের নাম করিত। কখনও বা তাহাদের মা আসিয়াছেন মনে করিয়া দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহার কোলে উঠিতে চেষ্টা করিত। কখনও বা দুই ভাই তাহাদের প্রতিদিনকার নির্দ্দোষ খেলা জুড়িয়া দিত। তাহাদের ঘরের কাছে একটা আম গাছ ছিল, তাহাতে কতকগুলি পাখীর বাসা ছিল। তাহাদের ঘর হইতে পাখীর ছানা-গুলির কিচির মিচির শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়; তাহারা সোৎসুক নয়নে জানলার মধ্য দিয়া সেই সব নীড়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। ইহাদের কথাবার্ত্তায়, ধরণধারণে মনে হয় না যে ইহারা আজ মরণ পথের যাত্রী। ক্রমশই তাহাদের শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। তাহাদের গন্তব্য সীমা নিকটতর হইতেছিল। আমি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহাদের নিকটেই ছিলাম। মৃত্যুর একটু পূর্ব্বে হর বলিল 'চল ভাই হরি নদীর ধারে যাই, সেখানে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া, সবুজ ঘাসের উপর শুইগে চল।' ইহার পর সে আর কথা কহে নাই।

"এক ঘণ্টার মধ্যে দুই ভায়ের প্রাণ বাহির হইল। আমি যখন বুঝিলাম হর আর বাঁচিয়া নাই, তাহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া হরিকে উঠাইতে গিয়া দেখি সেও আর জীবিত নাই। তাহাকে কোলে করিয়া আনিয়া হরের পাশে শোয়াইয়া

দিলাম। ঐ যে সমাধি স্তম্ভের উপর উহাদের যে ভাবে শায়িত দেখিতেছ—ঠিক সেইভাবে শোয়াইয়া রাখিলাম।"

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠ অবরোধ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার চোখ দু'টি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। তিনি একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমার তখন এ ইচ্ছা নয়—বৃদ্ধ এই শোকার্ত্ত ঘটনা লইয়া আর বেশী আলোচনা করেন। আমি সেখান হইতে উঠিয়া স্তম্ভটীর নিকটে গেলাম। স্তম্ভটীর কারুকার্য্য ও পরিকল্পনার সুখ্যাতি না করিয়া পারা যায় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ প্রকৃতিস্থ হইলেন। আমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। বৃদ্ধ কহিলেন "ছেলে দু'টির মাকে আনিবার জন্য তার করিয়াছিলাম। তাঁহার পক্ষে ইহাদের জীবিতকাল মধ্যে এখানে আসা অসম্ভব তাহা আমি জানিতাম। মৃত্যুর পরও যদি একবার শেষ দেখা দেখিতে পান ভাবিয়া কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষাও করিয়াছিলাম। তথাপি তিনি আসিলেন না। ক্রমশঃ তাহাদের সুন্দর দেহে ধ্বংশের লক্ষণ এক এক করিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহাদের শ্মশানভূমিতে লইয়া গেলাম। ও! সেদিনের দৃশ্য আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই শিশু দু'টিকে দেখিবার জন্য শ্মশানে সমাগত হইয়াছিল। শুধু বিলাপধ্বনি ও দীর্ঘশ্বাস

ভিন্ন আর কিছু শোনা যাইতেছিল না—তুইটী বিদেশী শিশু এখানকার লোকদের মন এমনই করিয়া হরণ করিয়াছিল। তাহাদের পোড়াইয়া যখন আশ্রমে ফিরি সেই সময় একখানা গাড়ী আসিয়া আশ্রমের দরজায় দাঁড়াইল। এই গাড়ীতে তাহাদের মা আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে দেখিবা মাত্র কহিলেন—'উহারা যে বাঁচিয়া নাই আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এবং সেই জন্যই মনকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিতে পারিয়াছি। আর একটু আগে আসিতে পারিলে তাহাদের নশ্বর দেহ একবার দেখিতে পাইতাম! বিধাতার তাহা ইচ্ছা নয়। ভাল, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক! উহাদের সহিত আমার পৃথিবীর সম্বন্ধ ত চুকিয়া গেল। এখন অন্যত্র কবে তাহাদের কোলে পাইব তাহারই সাধনায় জীবন যাপন করিগে। গুরুদেব, এ জীবনে আমার কোন ইচ্ছাই, কোন সাধই বিধাতা পূর্ণ হইতে দিলেন না। আপনি আমার কাছে প্রতিশ্রুত হন—আমার শেষ সাধটি অপূর্ণ রাখিবেন না। তাহাদের দেহ যে স্থানটীতে পঞ্চভূতে লীন হইয়াছে সেখানে একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে ইহাদের মূর্ত্তি খোদিত করিবেন। আমার জন্য ভাবিবেন না। দারুণ ক্ষয়-রোগের কীট আমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। আমার এখানকার মেয়াদ শেষ হইয়া আসিয়াছে।'

এই বলিয়া আমার পায়ের ধুলি লইয়া সেই গাড়ীতেই ফিরিয়া গেলেন। আমি তাঁহার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছি। এই স্তম্ভটি তাহার সাক্ষ্য। ইহাই আমার এখন একমাত্র সান্ত্বনা।"
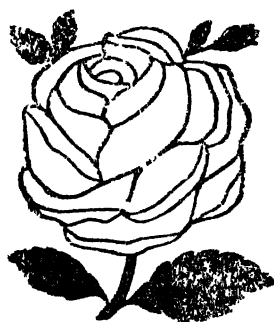
(৫)

কনিষ্ঠাঙ্গুলি

সে দিন শীতটা প্রবল ভাবেই দেখা দিয়েছিল। আমরা চার বন্ধুতে বিনোদের বৈঠকখানায় বসে একে একে তিন পেয়ালা চা খেয়ে আর পাঁচ কল্‌কে তামাক পুড়িয়েও শরীরটা যথেষ্ট রকম গরম করে তুলতে পারলাম না। কাপড়ের ভিতর হতে হাত বের করি তার সাধ্য কি! সে দিন সন্ধ্যাকালীন পাশা খেলাটা কাজে কাজেই বন্ধ করতে বাধ্য হতে হল। এমন অবস্থায় আমাদের মত নিরীহ বঙ্গ-সন্তান আর কি করতে পারে। বেশ করে মুড়ি স্মুড়ি দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে একমনে পরচর্চ্চা করতে লেগে পড়া গেল।

এ-কথা সে-কথার পর, কথা-প্রসঙ্গে আজকালকার মেয়েদের কথা এসে পড়ল। সমাজে স্ত্রী পুরুষের কার কি প্রভাব, স্ত্রী ও পুরুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত কি না? পুরুষের যে সকল অধিকার আছে মেয়েদের তার অংশ পাওয়া উচিত কিনা, মেয়ে ডাক্তারের মত মেয়ে উকিল হলে কেমন হয়, এইরূপ কত বিষয়ের আলোচনা হল

তার ঠিক ঠিকানা নাই। তারপর স্থানীয় ভদ্র মহিলাদের মুণ্ড চর্ব্বিত হওয়ার পর আমাদের ডিপুটী বাবুর স্ত্রীর কথা এসে পড়ল। বিনোদ বল্লে—আচ্ছা ইনি কেমন লোক বলত? এঁরা যখন এখানে প্রথম আসেন তখন তাঁর খুবই সুখ্যাতি শুনতে পাওয়া যেতো।

বিপিন বল্লে—শুনেছি তিনি নাকি ভারি মিশুক। সকলের বাড়ীতেই যাওয়া আসা করেন। এত বড় ডিপুটীর পরিবার, অহঙ্কার থাকারই কথা, কিন্তু এঁর ব্যবহারে তা একবারেই টের পাবার জো নাই। তিনি যেখানেই যান, বেশ একটু আত্মীয়তা স্থাপন না করে ফিরেন না। তাঁর কাছে পেটের কথা চেপে রাখা অসম্ভব। যেমন কোরেই হোক্ বের করে নেবেনই।

সুরেশ কহিল—তা বটে, কিন্তু এই নতুন আত্মীয়তা কতদিন স্থায়ী হয় সেইটা দেখবার বিষয়। আমার কি মনে হয় জান! এমন জোর করে আত্মীয়তা বেশীদিন স্থায়ী হয়না। আমার মনের নিভৃত কোনে যে গোপন কথা আছে তা তুমি যে দিন টের পাবে, সেদিন হতে তোমাকে আমি ভয়ের চোখে দেখব, ভালবাসার চোখেও নয়, আত্মীয়তার চোখেত নয়ই।

বিনোদ কহিল—খুব খাঁটি কথা বলেছিস তুই সুরেশ! আমি শুনেছি ডিপুটী বাবুর স্ত্রীকে বিশ্বাস করে সব কথা

বল্‌তে মেয়েরা আজ কাল একটু ইতস্ততঃ করতে আরম্ভ করেছেন। ইনি নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত চাপা, আর অপরে যদি কোন কথা গোপন করে ইনি তাতে রাগ করেন, অভিমান করেন। এমন স্বভাবের মেয়েকে ভাল বলি কি করে?

বিপিন কহিল—এরূপ স্বভাবের মেয়ের সংখ্যা যে খুব বেশী তা বোধ করি বলা যায় না। মেয়েদের যেমন স্বভাব পেটের কথা কিছুতেই গোপন রাখতে পারে না। আমার কি মনে হয় জান! যে সব মেয়ে অত্যন্ত চাপা, মনের কথা কিছুতেই প্রকাশ করে না, তারা বেশী ভয়ঙ্কর না যারা কোন কথা চাপতে জানে না, ভারী খোলাখুলী স্বভাবের তারা বেশী ভয়ঙ্কর? আমি বল্লেম—আমার মনে হয়, দুটোর কেউও প্রশংসার যোগ্য নয়। সব জিনিসের মাঝামাঝিটাই ভাল। অপরকে সব কথা বলতে হবে তার কোন মানে নাই, আবার সব কথাই যে গোপন করতে হবে তারও কোন অর্থ নাই। আচ্ছা, আমাদের যে নতুন ডাক্তার বাবুটী এসেছেন তাঁর স্ত্রী কেমন বলত?

বিনোদ—ওঁরা অল্পদিনই এসেছেন, সকলের সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগও হয়নি। ওঁকে যতটুকু দেখা যায়—লজ্জার ভাগ যেন কিছু কম, আর অহঙ্কারের মাত্রা কিছু অধিক বলেই যেন মনে হয়। প্রত্যহ সকালে

বিকেলে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে করে যে ভাবে বেড়ান, তাতে তাঁর যে এখানে সুখ্যাতি হবে, সে কথাত মনে হয় না।

আমি বল্লেম—সুখ্যাতি না হবার প্রধান কারণ এই বলে মনে হয়—অনেক সময় প্রকৃত সুখ্যাতির পাত্র কে তা আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী দশজনের সম্মুখে বের হন এবং হয়ত অপর মেয়েদের মত ঘাড়টা হেট না করে সম্পূর্ণ সোজা করে পথ চলেন। এ হতে তাঁর সম্বন্ধে একটা প্রতিকুল সিদ্ধান্ত করা যে সঙ্গত আমার তা মনে হয় না। মনে কর তাঁর যদি এমন ধারণা থাকে স্বাস্থ্যের খাতিরে প্রত্যেকেরই প্রত্যহ খানিকটা সময় খোলা বাতাসে বেড়ান উচিত। আর বেড়াবার সময়েই হোক কি অন্য সময়েই হোক কুঁজো হয়ে না থেকে সোজা হয়ে থাকা উচিত তাহলে তাঁর বেড়ান ও চলার ভঙ্গিমাটাকে দোষ না দিয়ে প্রশংসাইত করতে হয়। তিনি বাইরে বেরোন এটা তোমাদের চোখে কেমন কেমন ঠেকে, না? আমাদের ব্রজ ভায়ার পরিবারটি সাধারণতঃ বাড়ীর বার বড় একটা হন্ না। আর যদি কদাচিৎ হন্ মুখখানি দেড়হাত ঘোমটার অন্তরালে লুক্কায়িত থাকায় লোকের দৃষ্টিগোচর হবার জোটি নাই। কিন্তু তিনি যখন মাজায় কাপড় জড়িয়ে শাশুড়ীর সঙ্গে রণরঙ্গে মত্ত হন তাঁহার হুঙ্কারে সমস্ত পাড়াটা সরগরম হয়ে

উঠে, তখন ত তোমরা বেশ নিশ্চুপ থাক; এর মধ্যে কোন প্রকার বিষ-দৃশ আচরণ থাক্‌তে পারে তা তোমাদের ভুলেও মনে হয় না। ডাক্তার বাবুর বাসাটা নাকি আমাদের বাসার কাছে বলে ওঁদের সম্বন্ধে সমস্ত জানবার আমার যত সুবিধা এমন বোধ হয় আর কারো নয়। ওঁদের যেরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখি এমন বোধ হয় আর কাউকে নয়। ডাক্তার বাবুর স্ত্রীর চরিত্রে কেমন একটা বেশ দৃঢ়তা ব্যবহারে কেমন একটা কমনীয়তা, মুখে সর্ব্বদার জন্য কেমন এক রকম প্রফুল্লতা যেন সর্ব্বদা বিরাজ করছে। উনি ছেলেদের খুবই স্নেহ করেন বটে কিন্তু তাদের কোন প্রকার অন্যায় আবদারের একেবারেই প্রশ্রয় দেন না। এই যে পাড়ার অনেক ছেলে মেয়ে আছে, দেখ ডাক্তারের ছেলে মেয়ে গুলিকে—কেমন স্বাস্থ্য, কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কেমন মিষ্ট মুখের কথা! এ সবই ত মায়ের শিক্ষার গুণে। আমাদের মেয়েরা বিপদ দেখা দিলে, একবারে বুদ্ধি-সুদ্ধি হারিয়ে যেন হাবুডুবু খেতে থাকে। কিন্তু আমাদের ডাক্তার-গিন্নির বিপদেই বা কি সম্পদেই বা কি, সব সময় চিত্ত স্থির, এই সে-দিন আমার ছোট খোকার ফিট হয়ে যাবার দশা হয় আর কি, উনি এসে ধীরে ধীরে মাথায় জল ঢেলে, কেমন সুস্থ করে রেখে গেলেন। সংসারের

সমস্ত খুটিনাটি বিষয়ে তাঁর সমান দৃষ্টি। একটা চাকরের অসুখ করে যদি যত্নের একটুও ত্রুটি হবার জো নাই। আমার স্ত্রী বলেন ওব মত মানুষ আর হয় না।

বিনোদ কহিল—মেয়েদের মুখে শুনেছি এঁর নাকি বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটা নাই, শুনেছি এর মধ্যে নাকি কি একটা রহস্য আছে।

আমি কহিলাম—রহস্য আর এমন কি? ওঁর আঙ্গুলটা কি করে গেল, তা যদি শুন, ওঁর প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা না জন্মিয়ে যাবে না। আমি যা শুনেছি তোমাদের বলি শুন —

ডাক্তার বাবুর স্ত্রীর নাম সরলা। ওঁর বাপ মধ্য-ভারত-বর্ষে কোন স্থানে ওকালতি করতেন। ওদের বাড়ীর কাছে একটী ভদ্র লোক থাকতেন, তাঁর নাম দেবেন্দ্র বাবু। তাঁর বীণা আর মীনা বলে তু'টী মেয়ে ছিল। বীণা ও সরলার বয়স তখন নয় বৎসর আর মীনার ছয় বৎসরের বেশী নয়; মীনাকে সরলা ছোট বোনের মত ভাল বাসত। তখন বর্ষাকাল, পার্ব্বত্য নদীতে জল পড়েছে। তিনজনে নদীতে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে খেলা করতে গিয়েছে। নৌকা ভাসান শেস হলে একখানা পাথরের উপর বসে গল্প করছিল। সরলার দাদা কলকাতাতে ডাক্তারী পড়তেন। দাদার মুখে সরলা কলকাতার যে-সব গল্প শুনেছিল সে-সব

আশ্চর্য্য গল্প করছিল। নিকটে একপাল ভেড়া চরছিল। মীনা তাই দেখতে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর মীনা সাপে কামড়ালে বলে চীৎকার করে উঠল। সরলা ও বীণা ছুটে গিয়ে দেখলে মীনা মাটিতে পড়ে আছে আর একটা সাপ সন্ সন্ করে ছুটে যাচ্ছে। মীনাকে জিজ্ঞাসা করে সরলা জানল সাপে মীনার কড়ে আঙ্গুলে কামড়িয়েছে। সরলা দেখলে মীনার বাঁ-হাতের কড়ে আঙ্গুলে সাপের দাঁতের দাগ আছে। সরলা তার দাদার মুখে শুনেছিল—সাপে আঙ্গুলে কামড়ালে যদি সেই দণ্ডে আঙ্গুলটা কেটে ফেলা যায়, বিষ ভিতরে গিয়ে প্রাণ নাশ করতে পারে না। সরলা বল্লে—তুই শীগ্‌গার তোর আঙ্গুলটা কাটতে দে, বাঁচার এই একমাত্র উপায়। আঙ্গুল কাটার কথায় মীনার ভয় আরও বেড়ে গেল, সে কিছুতেই রাজী হ'ল না। শেষে সরলা বল্লে দেখ মীনা তুই আঙ্গুল কাটতে ভয় কচ্ছিস্ একটা আঙ্গুল বড় না জীবন বড়? আচ্ছা আমি যদি আমার আঙ্গুল কাটি তবে কাটবি ত?

মীনা কহিল—না, না তোমাকে আঙ্গুল কাটতে হবে না। আমি এখন বেশ ভাল বোধ কচ্ছি। তোমার পায়ে পড়ি আঙ্গুল তুমি কেটোনা।

সরলা কহিল—দেখ মীনা আসবার সময় মাসীমা তোর ভার আমাকে দিয়েছিলেন। যা করলে তোর জীবন রক্ষা

হত তুই তা করলি না। আমি যদি তোর ভয় ভাঙ্গাবার জন্য নিজের আঙ্গুল কেটে ফেলি লোকে আমার দোষ দিতে পারবে না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মীনা বললে তুমি যদি কাট সরলা-দি আমিও কাটব। সরলা কহিল—এই দেখ আমি কেমন হাসতে হাসতে আঙ্গুলটা কেটে ফেলে দিচ্ছি। এই বলে একখানা ধারাল পাথরের উপর আঙ্গুলটা রেখে আর একখানা পাথর দিয়ে দুই চারবার জোরে আঘাত করায় আঙ্গুলটা ছিন্ন হয়ে পড়ে গেল। বীণা এর আগে ছুটে পালিয়ে বাড়ীতে গিয়ে খবর দিয়েছিল। সরলার দাদাকে সঙ্গে করে বীণা কিছুক্ষণ মধ্যে সেখানে উপস্থিত হল। সরলা তার দাদাকে আসতে দেখে বল্লে দাদা মীনার আঙ্গুলটা শিগ্রী কেটে ফেল, সাপে যে কামড়িয়েছে! সরলার দাদা কহিলেন—যদি কামড়িয়ে থাকে, এখন কেটে আর কি ফল? বিষ কি আর এতক্ষণ আঙ্গুলে বসে আছে? শরীর-ময় ছড়িয়ে পড়েছে। এই বলে তিনি মীনাকে পরীক্ষা করে বললেন—হাঁ কামড়িয়েছে ঠিক তবে বিষ চালতে পারে নি। ভয়ের কোনই কারণ নেই। তারপর সরলাকে দেখে বল্লেন তোর হাতে আবার কি হল? অমন করে কাপড় জড়িয়ে ঢেকে রেখেছিস যে বড়? মীনা আঙ্গুল কাটার ব্যাপার সমস্ত বিবৃত করল। সরলার দাদা ভগ্নিকে বুকে চেপে ধরে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

বাড়ীতে এসে সরলার দাদা বল্লেন—সরলা যদি আমার বোন না হয়ে ভাই হত তাহলে বেশ হত। তবে এ সাহসের মর্য্যাদা লোকে ঠিক বুঝতে পারত। তা না— জন্মাল মেয়ে হয়ে, এ আর কি কাজে লাগবে বল্?

সরলার মা বল্লেন—তুই যাই বল না কেন, সরলা মেয়ে বলেই ত এ কাজ করতে পেরেছে। ছেলে হলে কিছুতেই পারত না। তুই এতে সুধু সাহসই দেখছিস্, কিন্তু সাহস ছাড়া এর মধ্যে আর একটা জিনিস আছে যেটা তোর চোখে পড়ছে না। সেটা কি জানিস? পরের জন্য আত্মবলি দেওয়া। ও যা বিসর্জ্জন দিল, সেটা আর পাবে না জেনেও পরের জন্য বিসর্জ্জন দিল; জলমগ্ন ব্যক্তিকে বাঁচাবার জন্য জলে ঝাঁপ দিবার মত সাহস পুরুষের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু আমার সরলা আজ যা করেছে তা কেবল মেয়েরাই করতে পারে, পুরুষের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়।

বোধকরি সরলার মাতা অন্যায় বলেন নি কিছুই।

ভীষণ আবিষ্কার

প্রথম দৃশ্য।

ব্রেকব্যাড (Break Bad) কোম্পানীর বুককীপার

(Book Keeper) গোবিন্দ বাবুর বৈঠকখানা।

[একদিকে তক্তপোষ, তাহার উপর ফরাস, কয়েকটা তাকিয়া বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া আছে। অন্যদিকে চেয়ার টেবিল প্রভৃতি। গোবিন্দ বাবু ও বিপিন বাবু মুখামুখী বসিয়া গল্প করিতেছেন।]

গোবিন্দ—তারপর বিপিন! তোমার এতদিনের প্রতিজ্ঞাটা ভেঙে ফেলে শেষে বিয়ে করে আমাদেরই মত সংসারী সাজলে হে?

বিপিন—কি করি ভাই, বিয়ে না করে আর কিছুতেই চল্‌ল না।

গোবিন্দ—তার মানে? এত দিন চল্ল—আর এখন চল্ল না! পিরিতে পড়েছিলে নাকি?

বিপিন—পিরিতে নয়, দায়ে—

গোবিন্দ—দায়ে—সে আবার কি হে?

বিপিন—ভাই—যতদিন একজামিনগুলি পাশ করবার ছিল ততদিন পাশের নেশায় বেশ একরকম কেটে যাচ্ছিল, তখন কোন কিছুরই তেমন অভাব বুঝতে পারিনি। উকীল হয়ে যেই কোর্টে যাওয়া আসা ধরলাম—অমনি বুঝতে পারলাম আমার এই কুমার জীবন ওকালতি ব্যাবসার সাথে ঠিক যেন খাপ খাচ্ছে না। দেখি—সকলে কাজ করে একটা উদ্দেশ্য সামনে রেখে। কিন্তু আমার কিসের জন্য? জানইত আমার যা আছে তাতে খাওয়া পরার ভাবনা কোনদিন হবার কথা নয়। তাই সর্ব্বদায় মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠত—আমার ওকালতি করা কিসের জন্য? শেষে বিরক্ত হয়ে ওকালতি ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে মন দিলাম। তাতেও মনের তৃপ্তি হল না। মনের মধ্যে সর্ব্বদার জন্য কিসের যেন একটা অভাব অনুভব করতাম। তাই মা যখন বিয়ের জন্য চেপে ধরলেন তখন আর কোন আপত্তি করলাম না। সুবোধ সুশীল ছেলের মত মাতৃ-আজ্ঞা পালন করলাম।

গোবিন্দ—তারপর এখন লাগছে কেমন?

বিপিন—খেয়ে পস্তান আর কি! তবে না খেয়ে পস্তাবার চেয়ে ভাল। আগে মনে ক'রতাম—বিয়ে করে

তোমরা বুঝি খুব সুখে আছ; মনে বড় হিংসা হ'ত। এখন দেখছি আমারো যে দশা, তোমাদেরও সেই দশা। হতভাগ্য বিবাহিত পুরুষগুলির সকলেরই সমান দুর্দ্দশা।

গোবিন্দ—দুর্দ্দশাটা এমন কি দেখলে শুনি?

বিপিন—কি দেখলাম? বিয়ের আগে সাম্য, মৈত্র, স্বাধীনতার স্বপ্নে পুরুষের হৃদয় বিভোর হয়ে থাকে, বিয়ের পর একটা নারীর আকর্ষণে সে সব কোথায় দূর হয়ে যায় বলত? পুরুষ জগৎ-খানাকে উর্দ্ধে তুলতে চায়, কোথা হতে নারী নামে একটা স্বার্থপর জীব এসে, তাকে নীচের দিকে টেনে রাখতে চায়; জগৎটা এক পাও অগ্রসর হতে পারছে না. বিশ্বটা যেন নিজের ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

গোবিন্দ—তুমিত এক নিশ্বাসে অনেকগুলি বড় বড় কথা বলে ফেল্লে, জিজ্ঞাসা করি এই নারী প্রেমই কি শেষে বিশ্ব-প্রেমে রূপান্তরিত হয় না? ইনিই ত মাতৃরূপে, পত্নীরূপে, কন্যারূপে বিশ্ব-প্রেমের মধ্যে বিরাজ করছেন। একে ভাল না বেসে যে বিশ্বকে ভালবাসতে পারা যায়—একথা আমার ত মনেই হয় না। যে আপনার জনকে

ভালবাসতে পারে না সে সমস্ত বসুধাকে কুটুম্ব করবে কিসের বলে বলত ? আরও একটা কথা— উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি ও স্বাধীনতা ঠিক এক জিনিষ নয়। উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে বাধা না দিলে যে তৈরী জিনিষ ভেঙ্গে ফেলে দেয়। আর স্বাধীনতা চিত্তকে উদার করে তোলে। নারী পুরুষের এই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে লাগাম দিয়ে টেনে রাখে—স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে যায় না।

বিপিন—তুমিত চিরকালই স্ত্রীজাতির পক্ষে ওকালতি করে আসছ—এখনও যে করবে এত জানা কথা। কিন্তু ভাই—ওসব বড় বড় কথা না হয় নাই তুল্লাম; কিন্তু নারীর মন যে পুরুষের চেয়ে অনেক সঙ্কীর্ণ, নীচ এবং হিংসা ও সন্দেহে পরিপূর্ণ— একথা ত স্বীকার করতেই হবে!

গোবিন্দ—নারী যে এত নীচমনা আর পুরুষ যে এত উচ্চমনা কিসে তাত ভাই আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। উচ্চ নীচ দুইএর মধ্যেই আছে। যার বরাতে যেমনটী জোটে আর কি!

বিপিন—ভাই দুঃখের কথা আর তোমাকে কি বলব ? বিয়ে করা অবধি ঠিক যেন পুলিশের নজরবন্দী হয়ে আছি। বেড়াতে গিয়ে একটু বিলম্ব হয়—অমনি

প্রশ্ন—কোথায় গিয়েছিলে ? কি করছিলে ? যদি কোন বিষয় একটু ভাবব—অমনি প্রশ্ন—কি ভাবছ ? কাকে ভাবছ ? সর্ব্বদায় যেন কৈফিয়তের উপরই আছি। এ সব যা হোক এক রকম সয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ কাল আর একটা নূতন উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

গোবিন্দ—নূতন উপসর্গ আবার কি ?

বিপিন—বাড়ীতে একটা নূতন ঝি এসেছে, তাকে সকলে চন্দ্রে বলে ডাকে।

গোবিন্দ—নূতন ঝি ? বয়স কত ? দেখতে কেমন হে ?

বিপিন—বয়স কত ঠিক বলতে পারি না। তবে যৌবনটা যে বেশী দিন তার দেহকে আশ্রয় করেছে—তা অবশ্য বলা যায় না। রংটা দিব্যি কালো—কিন্তু বেশ উজ্জ্বল, শ্রীহীন বলা যায় না বলে মনে হয়। যৌবন-জোয়ার তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে কুলে কুলে প্লাবিত করে রেখেছে। দিব্যি পাড়াগেঁয়ে স্বাস্থ্যপূর্ণ ভাবটি তার চোখে মুখে সর্ব্বত্র যেন বিরাজিত—একবার দৃষ্টি পড়লে তখনই ফিরে আসতে চায় না,—শরীরটার উপর চোখ বুলিয়ে নিতে ইচ্ছা করে।

গোবিন্দ—তারপর ?

বিপিন—আমার অপরাধ—আমি তাকে চন্দুরে ব'লে না ডেকে চন্দ্র বলে ডাকি, আর সে সময় নাকি গলাটা জড়িয়ে গিয়ে স্বরটা একটুখানি নরম হ'য়েই বেরোতে থাকে। আমাদের উনি বলেন—"চন্দুরে ঝিকে চন্দুরে বলে না ডেকে চন্দ্র বলে ডাক কেন?"

গোবিন্দ—চন্দুরে বলে ডাকলেই যদি সব গোল চুকে তা হ'লে তাই বলেই না হয় ডাকলে? তাতেত ওই এক জনই সাড়া দেবে।

বিপিন—তুমি এমন কবিভাবাপন্ন হয়ে একেবারে অকবির মত কথাটা বলে ফেল্লে হে? চন্দুরে বলে ডাকলেও যে চন্দ্র ঝিই উত্তর দেবে—তাকি আর আমি জানি না? ও গরীব মানুষ, পেটের দায়ে খাটতে এসেছে—ভাল করেই ডাক আর মন্দ করেই ডাক তাতে ওর কিছু আসে যায় না। কিন্তু এর মধ্যে যে যৌবনটা এসেছে—সেটাত উপেক্ষার জিনিষ নয়? তাকে অমান্য করলে নিখিলের সব সৌন্দর্য্যকেই যে উপেক্ষা করা হয়। বসুন্ধরা যে দিন ফিরোজা রঙের সাড়ীখানা প'রে বিচিত্র বর্ণের পুষ্প ভূষণে সুশোভিতা হ'য়ে দেখা দেন, সৃষ্টির সমস্ত সুকণ্ঠ

পাখী কেন তাঁর স্তুতি গান করে বলত? জানত ভাই—আপনার সন্তানটী যখন বড় হয়, তখন তাকেও সম্ভ্রম ভরেই ডাকতে হয়। এ যে নিতান্ত স্বাভাবিক।

[নেপথ্যে] ঝি, ঝি, ও ঝি! বাবুকে ডেকে দেনা? দশটা যে বাজে—নাওয়া খাওয়া নাই নাকি? অফিসে যেতে হবে না বুঝি?

বিপিন—তোমার এখানেও যে পুলিশের শাশন নেই—সে কথা বলা যায় না। এখন তবে উঠি ভাই—আর এক দিন আসা যাবে।

গোবিন্দ—আর এক দিন কেন? আজ রাতেই কেন এস না?

বিপিন—না ভাই—আজ আর হবে না। বিশেষ কাজ আছে। [প্রস্থান]

[বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদ—এতক্ষণ ও কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে? ওঁকেত এর আগে কখন দেখি নি?

গোবিন্দ—ও বিপিন—আমার ছেলে বেলাকার বন্ধু।

বিনোদ—ছেলে বেলাকার বন্ধু নাকি? কই ওঁর কথাত তোমার মুখে একদিনও শুনিনি? এমন বন্ধু—দেখা হ'লে খাওয়া দাওয়া, অফিস যাওয়া সব ভুল

হ'য়ে যায়। আমি সাধে বলি—তুমি আমাকে সব কথা বল না।

গোবিন্দ—সত্যি নাকি? এ সংবাদটা আগে কই জানতাম না—ভাগ্যিস মনে করে দিয়েছ! আচ্ছা—আমার ছেলে বেলাকার কথা জানবার জন্য তোমার এত কৌতূহল হয় কেন?

বিনোদ—কি জানি? তোমার সব কথা না জানতে পেলে যেন মনে হয় তোমাকে সম্পূর্ণ ভাবে পাই নি। আচ্ছা তুমি এক কাজ কর না কেন? তোমার একটা জীবন-স্মৃতি লিখে ফেল না কেন?

গোবিন্দ—[হাস্য সহকারে] যে জীবন! তার আবার স্মৃতি? লিখিই যদি সময় নষ্ট করে—পড়বেই বা কে?

বিনোদ—আর কেউ পড়ুক না পড়ুক—আমিত প'ড়ব।

গোবিন্দ—হাঁ—একটি পাঠিকা জুটবে নিশ্চয়—তিনি বড় কেউ কেটা নয়। [বিনোদিনীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া চুম্বন করিলেন]

বিনোদ—[কৃত্রিম রোষভরে] কি কর—কি কর! কেউ হঠাৎ দেখে ফেললে কি মনে করবে বলত?

গোবিন্দ—যা মনে করবার ঠিক তাই ক'রবে, একটুও এদিক ওদিক করবে না।

বিনোদ—আজ কাল তোমার লোভটা বড্ড বেড়ে গিয়েছে

দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা—চুমোতে কি তোমার অরুচি ধরে না ?

গোবিন্দ—আরে বাপরে! ও জিনিসে যে দিন অরুচি ধরবে—সেদিন বদ্যিতে কি আর আমার নাড়ী খুজে পাবে মনে করছ ?

[এই বলিয়া সুর করিয়া গাহিতে লাগিলেন]

যে দিন ওই বিম্বাধরে
চুম্বনে অরুচি হবে :
সে দিন কি ভাব প্রিয়ে
এ দেহে আর প্রাণ রবে!
কণ্ঠ করবে ঘড় ঘড়,
বুকের মধ্যে ধড়ফড়,
বদ্যিতে নাড়ী না পাবে।
ফাগুন পূর্ণিমা রাত্র
দহিবে সকল গাত্র ;
পাপিয়ার পিউতান
কর্ণে যেন বিষবাণ ;
এ দেহে কি প্রাণ রবে!

বিনোদ—নেও নেও—ঢের হয়েছে ; অমন ন্যাকামোতে আর কাজ নাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোবিন্দ বাবুর বাহির ঘর।

[গোবিন্দ বাবু অফিসের বেশে সজ্জিত; চাপকানটার সকল বোতাম লাগান হয় নাই, ব্যস্তভাবে কি একখানা কাগজ খুঁজিতে ব্যস্ত আছেন।]

[পানের ডিবা হস্তে বিনোদিনীর প্রবেশ।]

বিনোদ—অমন করে কি খুঁজছ বলত ?

গোবিন্দ—একখান কাগজ রেখেছিলাম—পাচ্ছি না।

বিনোদ—রেখে থাক—অবিশ্যি আছে—যাবে কোথায় ?

গোবিন্দ—কই—এত খুঁজলাম—পেলাম না ত !

বিনোদ—তোমার আবার খোঁজা—আচ্ছা আমি বের করে দিচ্ছি !

[বিনোদিনী কাগজ খুঁজিতে লাগিল]

বিনোদ—না, তুমি এখানে রাখনি। দেরাজে রাখনি ত ?

গোবিন্দ—থাক আফিস থেকে ফিরে এসে দেখলেই হবে !

[প্রস্থানোদ্যত হইলেন]

বিনোদ—চাপকানটার বোতামগুলো অমনি থাকবে নাকি ? আফিসে সঙ দিতে যাচ্ছ না কি ?

গোবিন্দ—তাইত ! ভাগ্যে মনে করে দিয়েছ ! আরে—সাধে কি তোমাকে আমার কর্ণধার বলি !

[চাপকানের বোতাম লাগাইতে লাগিলেন, বিনোদিনী সাহায্য করিতে লাগিলেন।]

বিনোদ—তার পর মাথাটা অমনি কাকের বাসা হয়ে থাকবে নাকি? স্নান করে মাথায় চিরুনী বুরুষ দিতে এমন কি ভাগবত অশুদ্ধ হয় বলত?

[চিরুনী বুরুষ দিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিতে লাগিলেন]

বিনোদ—একটুখানি ঘাড়টা ঠিক করে রাখতে পারছ না?

গোবিন্দ—হয়েছে হয়েছে এতেই হবে! আফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

বিনোদ—[সম্মুখে আরসি ধরিয়া] দেখ দেখি এবার কেমন হল!

গোবিন্দ—[অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া] আহা মরি ঠিক যেন কার্ত্তিকটী!

বিনোদ—আমি ভাবি আমরা না থাকলে—হতভাগা পুরুষগুলোর কি দশা হত!

গোবিন্দ—একেবারে প্রাণে মারা যেত! এতেই ত প্রমান হয়—ঈশ্বর আছেন, আর তিনি বড় কম বুদ্ধিমান নন! এই ধর ঈশ্বর হাতি সৃষ্টি করে দেখলেন ঘাড়টা ছোট হয়ে পড়েছে মুখটা মাটি স্পর্শ করতে পারে না, অমনি কৌশল করে একটা শুঁড় জুতে দিয়ে ভুলটা

সংশোধন করে নিলেন। আমাদের বেলায় তোমরা ওই হাতির শুঁড়টাব মত আর কি! তোমরা না হলে আমরা টিকে থাকতেই পারতাম না, আমি সেই জন্যইত তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজ করি না!

বিনোদ—নেও—নেও—অত ঠাট্টায় আর কাজ নাই! এখন আফিসে যাচ্ছ যাও!

গোবিন্দ—এই দেখ হাতে হাতে প্রমাণ পেলে। ভাগ্যে মনে করিয়ে দিলে, না হলে হয়ত আজ আফিসেই যাওয়া হতো না। [অগ্রসর হইলেন]

বিনোদ—পান নেবে না!

গোবিন্দ—তাইত—আজ পদে পদে ভুল হচ্ছে

[পানের ডিবা লইয়া বিনোদিনীকে চুম্বন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন]

বিনোদ—ঠাকুরঝি গিরিজাদের বাড়ী গিয়েছেন; কই এখনো ফিরলেন না! তিনি যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ ঘরটা পরিষ্কার করে রাখি। ও মা! কালকের পাতা ধোয়া জাজিমখানার কি দশা করেছেন দেখ! এখানে কালি ওখানে চা ফেলে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। লক্ষ্মীছাড়া পুরুষগুলোর একটুও যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে!

তর্ক করবে কর, চেঁচাতে হয় চেঁচাও, বালিশ চাপড়াবার আবশ্যক কি? নতুন তাকিয়াদুটো একেবারে ফাটিয়ে তুলো বের করে ফেলেছে! আচ্ছা—এক কাজ করলে কেমন হয়! মোটা মোটা অক্ষরে দেওয়ালে লিখে রাখলে হয়—তাকিয়া মাথায় দেবার জন্য, চাপড়াবার জন্য নয়! এতে যদি ওঁর বন্ধুদের একটু চৈতন্য হয়! বন্ধুত জুটিয়েছেন একটি দুটি নয় পাড়াশুদ্ধ বল্লেই হয়! সন্ধ্যার পর জুটে কি যে হল্লা করে, রাগে গা জ্বলে যায়! ওঁর আবার বন্ধুদের বিরুদ্ধে কিছু বল্লে গায়ে সয় না; মুখ ভার করে বসে থাকেন। ওর আবার মুখ ভার করাটা আমার ভাল লাগে না।

[ফরাস ঝাড়িয়া জুতজাত করিলেন, তাকিয়াগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।]

না! ঠাকুরঝি ত এখনো এলেন না। ওঁকে রেখে একলা খাই বা কি করে? এইবেলা ওঁর কাগজখানা খুঁজে দেখি!

[টেবিল খুঁজিলেন, পাইলেন না]

না! এখানে নিশ্চয় রাখেন নি। দেরাজ খুলে দেখতে হয়। [একটা একটা করিয়া দেরাজ টানিয়া দেখিতে লাগিলেন] এটার মধ্যেও

কতকগুলো পুরোন খবরের কাগজ দেখছি। [হাস্য] দেরাজে রাখার উপযুক্ত জিনিষই বটে! আর এটার মধ্যে ত দেখছি কতকগুলি ভাঙা টিন আর থিয়েটারের প্রোগ্রাম। এটার মধ্য হ'তে না জানি আরও কত অদ্ভুত সামগ্রী বেরোবে! এটা কি! ওমা! এইত তাঁর গলাবন্ধ, সেদিন বাড়ীশুদ্ধ খুঁজে পাওয়া গেল না। একি! এ দেরাজটা চাবি বন্ধ কেন? সবগুলো খোলা আর এটা চাবি বন্ধ! এর মানে? নিশ্চয় এর মধ্যে গোপণীয় কিছু আছে। এই যে উনি বলেন আমার কাছে তাঁর গোপন কিছুই নাই। আজ আসুন হাতে হাতে মিথ্যা ধরিয়ে দেব। ওঁর চাবির গোছাত শোবার ঘরে আমার দেরাজের মধ্যেই থাকে। আচ্ছা এনে খুলে দেখা যাক! [প্রস্থান]

[কিছুক্ষণ পরে চাবি লইয়া প্রবেশ করিলেন ও দেরাজটী খুলিয়া ফেলিলেন।]

এটাতে দেখছি যত কিছু দরকারী কাগজ ও দলিলপত্র। হায় আমি ওঁর উপর কি অন্যায় সন্দেহই না করেছিলাম! এখানা কি? এ যে দেখছি একখানা ফটো! মেয়েমানুষের ছবি—দেখতেও সুন্দরী, বয়সও বেশী নয়! নিশ্চয় এর

সঙ্গে ওঁর ভালবাসা ছিল। আচ্ছা—ফটোখানা এমন সাবধান করে লুকিয়ে রাখবার কি দরকার ছিল? এতদিনে আমার সব গর্ব্ব দূর হয়ে গেল।

[ক্রন্দন]

[নেপথ্যে]

বিনু—বিনু! ওখানে কি কচ্ছিস?

[বিনোদিনী চমকিয়া উঠিলেন ও ফটোখানি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন]

[নিরুপমার প্রবেশ]

নিরু—এত বেলা হ'ল খাবিনে? এখানে কি কচ্ছিস?

বিনোদ—তোমার আসতে দেরী দেখে ওঁর কাগজ পত্রগুলো গুছিয়ে রাখছিলাম।

নিরু—তোর চোখ অমন ছলছলে আর মুখ অমন বিবর্ণ কেন?

বিনোদ—কই না ত? বোধ করি খাইনি তাই।

নিরু—না খেলে কি মানুষের অমন চেহারা হয়? আমি বেশ দেখছি—তুই যেন আমার কাছে কিছু গোপন কচ্ছিস। তোর মুখ দেখে বোধ হয়—তোর মনে যেন কিসের কষ্ট হ'য়েছে? দেখ বিনোদ—আমি তোকে ছোট বোনের মত দেখি; আমার কাছে কি কিছু লুকুতে আছে বোন।

[বিনোদিনীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, লুকা· ফটোখানা বাহির হইয়া পড়িল।]

এ ছবি তুই কোথায় পেলি ? আহা ! কি সুন্দর মুখখানা ! এ কার ফটো বলত ?

বিনোদ—[বিরক্তিভরে] জানি না]

নিরু—তুই পেলি কি ক'রে ?

বিনোদ—এই দেরাজটার মধ্যে ছিল। ঠাকুরঝি—এতদিনে আমার সব ভুল ভেঙ্গে গেল। [ক্রন্দন]

নিরু—এই ফটো পেয়ে নাকি ? তা মিছি মিছি কাঁদছিস কেন ?

বিনোদ—আজ থেকে কেঁদে কেঁদেই আমার জীবন যাবে। [ক্রন্দন]

নিরু—তোর সব তাতেই বড্ড বাড়াবাড়ি। পেলে দাদার দেরাজের মধ্যে একখানা মেয়েমানুষের ফটো, অমনি অভিমান ! জিজ্ঞাসা করতে হয় আগে—কার ছবি, কি বৃত্তান্ত, তারপর সন্দেহ করতে হয় করিস—মরতে হয় মরিস ! এওত অসম্ভব নয়—তাঁর কোন বন্ধু তাঁর স্ত্রীর ছবি তাঁকে উপহার দিয়েছেন ! নে—আর কাঁদতে হবে না, খাবি আয় ! দাদা এলে সব গোল মিটে যাবে।

বিনোদ—এ জন্মেত আর নয়। [দেরাজের মধ্যে ছবিখানি রাখিয়া দিলেন]

নিরু—আচ্ছা তাই, এখন খাইগে চল। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

গোবিন্দ বাবুর ভিতর বাড়ী।

[অফিসের বেশে গোবিন্দবাবু]

গোবিন্দ—কই? এরা সব গেল কোথায়? বামা! বামা!

[বামা ঝির প্রবেশ]

বামা—দাদাবাবু ডাকছ?

গোবিন্দ—হঁা—এদের কাউকে দেখছি না কেন?

বামা—তুমি আফিস যাওয়ার পর ছোট দিদিমণির কি হয়েছে, ঘরে শুয়ে আছেন।

গোবিন্দ—এমন সময় শুয়ে আছেন? অসুখ করেনি ত?

বামা—তা হবে বুঝি।

গোবিন্দ—হরিধন ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল?

বামা—না, ডাক্তার ডাকতে বারণ করেছেন।

গোবিন্দ—খোকা কোথায়?

বামা—তাকে দুধ খাইয়ে গাঙ্গুলিদের বাড়ী দিয়ে এসেছি। ওদের সেজে বৌ খোকাকে খুব ভালবাসে কি না!

[প্রস্থান]

[গোবিন্দর শয়নাগারের নিকট গমন]

গোবিন্দ—বিনু দরজাটা খোলত একবার।

[বিনোদিনী দরজা খুলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, গোবিন্দবাবু যেই তাঁহাকে ধরিবার জন্য বাহুপ্রসারণ করিলেন—বিনোদিনী অমনি পিছাইয়া গেলেন।]

গোবিন্দ—তোমার কি হয়েছে বলত ?

বিনোদিনী—হবে আবার কি ?

গোবিন্দ—তবে এ সময়ে শুয়ে আছ যে বড় ?

বিনোদ—আমার ইচ্ছে। আমাকে ডাকতে বারণ করেছিলাম—বামা সে কথা বলে নি ?

গোবিন্দ—বলেছে বৈকি! তোমার কি হয়েছে সেটাত জানা আবশ্যক।

বিনোদ—জেনে কি লাভ ? তোমার ও শুকনো আলাপে আর কাজ কি ? যেখানে গেলে তোমার মন ভাল থাকে সেখানে যাও।

গোবিন্দ—তাইত এসেছি।

বিনোদ—মিথ্যুক প্রবঞ্চক। আজ তোমার সব মিথ্যে ধরা পড়েছে। কি বলব খোকার কষ্ট হবে তাই। না হলে এতক্ষণ আর বেঁচে থাকতে দেখতে না।

গোবিন্দ—একেবারে প্রাণত্যাগের সংকল্প ?

বিনোদ—তা নাত কি ? যার স্বামী অবিশ্বাসী তার বেঁচে থাকার কি আবশ্যক ?

গোবিন্দ—অবিশ্বাসী ? কিসের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

[বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া ধরিতে গেলেন. বিনোদিনী জোরে হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।]

চতুর্থ দৃশ্য

গোবিন্দ বাবুর বৈঠকখানা।

[গোবিন্দ বাবু চিন্তামগ্নভাবে চেয়ারে উপবিষ্ট।]

গোবিন্দ—আজ সকাল হতে দিনটা কেমন বেতালে চ'লছে যেন। সকালে বিপিনের সাথে মিছিমিছি কতকগুলি বকলাম। আফিসে কাগজ ফেলে এসে বাড়ীতে বৃথা খোঁজাখুজি, একটা বুড়ি গাড়ীর তলায় পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল যা কখনো হয়নি—বড় সাহেবের কাছে অন্যায় অকারণ তিরস্কার; আবার বাড়ীতে এসে দেখছিত ভীষণ ব্যাপার। ইনি আমার উপর অকারণ রাগ করেছেন দেখছি। ভুলটা ভাঙাই কি করে? একি! আমার দেরাজে চাবি লাগান কেন?

[চাবি খুলিয়া নাকের কাছে ধরিলেন]

এ যে কুন্তলীনের গন্ধ! তবে ওঁরই কাজ হবে!

[দেরাজ খুলিয়া তাহার মধ্যে ফটো দেখিলেন]

য়্যা—এ ছবি কার এল এখানে? দিব্যি দেখতে ত! ওঁর কোন বন্ধুর নয়ত?

[কিছুক্ষণ ভাবিয়া]

ও হরি! এমন ভুলও হয়? এখন বুঝেছি—ওঁর রাগ কিসের জন্য। যাই—একটু মজা করিগে।

পঞ্চম দৃশ্য

গোবিন্দ বাবুর শয়নাগার।

গোবিন্দ—তুমি আমার দেরাজ খুলেছিলে ?

বিনোদ—হাঁ—ভয় নাইগো, তোমার কিছু চুরি যায়নি ; সবই তেমনি আছে।

গোবিন্দ—না—তা বলছিনে। ওর মধ্যে একখানা ফটো ছিল দেখেছিলে ?

বিনোদ—হাঁ—তা কি হয়েছে ?

গোবিন্দ—হবে আবার কি ? ছবিখানা কার বলত ?

বিনোদ—তা তুমি জান ? তুমি কাকে ভালবাস না বাস আমি জানব কি করে ?

গোবিন্দ—সত্যি—এ মেয়েটিকে আমি বড় ভালবাসি।

বিনোদ—ও কথা বলতে একটু লজ্জা হ'ল না ? একবারেই অধঃপাতে গিয়েছ ?

গোবিন্দ—ভালবাসি—এ কথা ব'লতে লজ্জা আবার কিসের ?

বিনোদ—তোমাব দুখানি পায়ে পড়ি—আমাকে একটু একলা থাকতে দেও।

গোবিন্দ—তাত দেবই। বলত মেয়েটি যথার্থ সুন্দরী কিনা ? তুমি যদি এর সাথে একবার কথা কইতে—আমার মত ভাল না বেসে থাকতে

পারতে না। বন্ধু যে তাঁর মেয়ের নাম অমিয়া রেখেছেন, সার্থক হয়েছে তাঁর নাম রাখা।

বিনোদ—[চমকিয়া] অমিয়া! তোমার বন্ধু কেশব বাবুর মেয়ে অমিয়া! এ ছবি তুমি আমাকে আগে দেখাওনি কেন?

গোবিন্দ—কেশব এখানে এনলার্জ করবার জন্য পাঠিয়েছিল। ভেবেছিলাম—বড় করে দেখাব। দিব্যি মেয়েটি, না?

বিনোদ—নিশ্চয়। কিন্তু যাই বল—এ ছবি আমাকে আগে না দেখিয়ে ভারি অন্যায় করেছ। আমি তোমার উপর কত অন্যায় সন্দেহ করেছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—প্রাণ থাকতে তোমার সাথে আর কথা কব না।

গোবিন্দ—আর এখন?

বিনোদ—এখন? [দৃঢ়ভাবে কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া চুম্বনের উপর চুম্বন করিতে লাগিলেন।]

ট্র্যাজেডী না কমেডী ?

জীবনটা বেশ একটা কমেডীতে শেষ হতে পারত, কিন্তু সুধু একটা ফুলষ্টপের অভাবে কত বড় একটা ট্রাজেডীতে পরিনত হল তার ইতিহাসটা এই—জন্মালাম বর্দ্ধমান জেলার নন্দীগ্রামে তিন কড়ি মুখুর্য্যের ছেলে হয়ে, আর তার শেষ হবে কোদালকাটির জমিদার রায় হারাণচন্দ্র চাটুর্য্যে বাহাদুরের একমাত্র বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে। জন্মালাম পর্ণ কুটীরে, মরব হয়ত রাজপ্রাসাদে। মনে পড়ে বেশ সে দিন, যে দিন আমার ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পালার প্রথম আরম্ভ। আমার বয়স তখন সাত আর দাদার বোধ করি দশ বছরের বেশী নয়। দাদা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমার খেলার সাথী ছিল মাঝের পাড়ার বাঁড়ুর্য্যেদের রাধারাণী। রাধার আর আমার প্রায় সমান বয়স।

তখন জষ্টীমাস, রাধাতে আর আমাতে গলা জড়াজড়ি করে জাম খেতে খেতে যাচ্ছিলাম আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে। এমন সময় বাবা ডাকলেন "কার্ত্তিক এদিক আয়।" আমার নাম ছিল কার্ত্তিক কেননা আমি খুব সুশ্রী ছিলাম বলে। সৌন্দর্য্যের যে মূল্য আছে সুধু নারীর বেলায়,

পুরুষের বেলায় নয়, এ কথার কোন মানে নাই। তার প্রমাণ দেখুন আমার বেলায়। বাবার ডাকে রাধাকে ত্যাগ করে গেলাম তাঁর কাছে। দেখি—বাবা আর একটা আদবুড়ো ভট্টাচার্য্যি গোছ লোক (ভট্চাজ বুঝলাম কেন না টিকি আর নস্যির ডিবে আছে) বসে কথা কচ্ছেন। বাবা আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে বল্লেন "এই ছেলেটি।" ভদ্র লোকটি ঘাড় তুলে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন "বড় সুন্দর ছেলেটিত, এসত বাবা এই দিকে" আমি যাই কি না যাই স্থির করতে না পেরে অবশেষে কেন জানি না গেলাম তাঁর কাছে। তিনি চশমাখানা বের করে, বেশ করে মুছে চোখে দিয়ে আমার ডান হাতখানা নিয়ে খুব মন দিয়ে কি সব দেখে, বেশ যেন একটু হৃষ্ট স্বরে বলে উঠলেন "বাঃ! দিব্যি লক্ষন ত সব, রাজপুত্র হবার উপযুক্তই বটে। তারপর দুজনের মধ্যে কি সব কথা হল, ঠিক মনেও নাই, হয়ত সে সময় ঠিক বুঝতেও পারিনি। পরের দিন হতে আমার যেন মনে হতে লাগলো, বাবা আর মা আমাকে যেন ঠিক পূর্ব্বের মত দেখছেন না। তাঁরা আমাকে যতই দূরে দূরে রাখলেন দাদা ততই আমাকে কাছে কাছে রাখতে লাগলেন। গ্রাম-ময় রাষ্ট্র আমাকে কোদালকাটীর রাজা পোষ্য পুত্র নেবে; সাতদিন পর নিয়ে যাবে, আর আসতে দেবেনা। কেন জানি না সেই হতে দাদা আমাকে একবার কাছছাড়া করত

না—পাছে কেও এসে আমাকে নিয়ে যায়। এক একদিন রাত্রে দৈবাৎ যদি ঘুম ভেঙ্গে যেতো, দেখতাম দাদা আমার পাশে বসে ঢুল্‌ছেন।

একদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখছি আমি আমাদের বাড়ীতে যেখানে ছিলাম সেখানে নেই। বেশ একখানা সুন্দর পালকীর মধ্যে শুয়ে আছি আর বেয়ারা শব্দ করতে করতে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। গরীবের ছেলে ছিলাম পাল্কী চড়ার সুযোগত কখনও হয়নি—বেশ লাগছিল। কিছুক্ষন পর পালকী এসে লাগল মস্ত একটা বাড়ীর সম্মুখে। অমনি কত লোকজন এল আমাকে দেখতে। আমাকে নামাল একজন পাল্কী হতে। অমনি একজন আদবুড়ো বাবুগোচ লোক আমাকে কোলে তুলে নিয়ে "এস এস বাবা এস, এই তোমার বাড়ী আমি তোমার বাপ" বলে চুমো খেতে লাগলেন। বাড়ীর ভিতর ঢুকতে না ঢুকতে গহনা পরা মোটামত একটি মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে আমাকে কোলে নিয়ে "যাদু এস, মাণিক এস" বলে কত আদর করতে লাগলেন। আমার সে সময় ভাল লাগছিল কি মন্দ লাগছিল ঠিক বুঝতে পারিনি—তবে একথা ঠিক আমার বাড়ীর কথা, দাদার কথা, রাধারাণীর কথা মনে ছিল না, সব যেন ভুলে গিয়েছিলাম। মনে পড়ল প্রথম রাত্রে শোবার সময়। সেই হতে মনের মধ্যে কেমন যেন করতে লাগল।

দিনের বেলাটা ওরা কত কি দেখিয়ে, কত রকমের খেলনা দিয়ে এক রকম করে আমাকে ভুলিয়ে রাখত কিন্তু রাত হলেই আমার বাড়ীর জন্যে মন কেমন করত। আমি যতই ওদের বাড়ীতে রেখে আস্‌তে বলতাম, ওরা ততই আমার বাপ মার নিন্দে করে, বাড়ীর উপর আমার ঘৃণা বিতৃষ্ণা জন্মাতে চেষ্টা করত।

বেলা তখন বোধ করি বারটা। দুজন চাকরে আমাকে উপরের বারান্দা হতে ময়ূরের নাচ দেখাচ্ছিল। এমন সময় শুনলাম দেউড়ি হতে কে যেন চেঁচাচ্ছে "কাত্তিকরে আয় ভাই!" ঠিক যেন দাদার গলা। আর দারওয়ানরা "ভাগ হিঁয়াসে" বলে কাকে যেন তাড়া দিচ্ছে। উপর হতে কে যেন হুকুম দিলে "এমনি না যায় মেরে তাড়িয়ে দে" চাকর দুটো আমার দুহাত ধরে সেখান হতে নিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকেও যেন একবার শুনেছিলাম, ঠিক যেন দাদার গলায় কে অস্ফুট স্বরে ডাকল "কার্ত্তিক রে আই ভাই!" তারপর কিছু দিনের কথা আমার মনে নাই, শুনেছি আমার নাকি শক্ত ব্যারাম হয়, কলকাতা হতে ডাক্তার এসে আমাকে আরাম করে।

ভাল হয়ে উঠে আমার মনে হল আমি কোদাল কাটির রাজপুত্র শ্রীভুবনেন্দ্র। শ্রীভুবনেন্দ্র হলেও আমি দাদার কথা একেবারে ভুলে যেতে পারিনি। সময় সময় দাদার

জন্যে আমার ভারি মন কেমন করত। একদিন হরে চাকরকে বল্লাম আমাকে দাদার কাছে নিয়ে যেতে পারিস বকশিষ দিব। উত্তরে সে যা বল্লে তার মর্ম্ম এই—আমাকে যেদিন এখানে নিয়ে আসে, দাদা ঘুম হতে উঠে আমাকে না দেখতে পেয়ে সারা গ্রাম আমাকে খুজেছে। একদিন কার মুখে শুনেছে আমাকে এখানে এনেছে। নন্দীগ্রাম হতে কোদালকাটী তিনক্রোশ পথ। একদিন দুপুর বেলা আমার সন্ধানে এখানে এসে উপস্থিত হয়। দরোয়ানরা দস্তুর মত প্রহার দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। মার খেয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী যায়। রাত্রে প্রলাপের সঙ্গে প্রবল বেগে জ্বর দেখা দেয়। জ্বর হয়ে দুদিন মাত্র বেঁচেছিল—বিকারের ঘোরে "কার্ত্তিকরে আয় ভাই, কার্ত্তিকরে আয় ভাই" বলে কেবলই চীৎকার করত।

দেখুন দিকি কি তাজ্জব ব্যাপার! বেশত একখানা কমেডী চলছিল কিন্তু একটা ফুলষ্টপ না পড়ায় কেমন একখানা ট্র্যাজেডী হয়ে দাঁড়াল। কোদালকাটির রাজপুত্রের যেমন শিক্ষা হওয়া উচিত, আমার তার কিছুরই অভাব হয়নি। লেখা পড়া সব রকম কিছু কিছু শিখেছিলাম গান বাজনাও মন্দ শিখিনি, ঘোড়ায় চড়া, শিকার—এ সব তাতেই খুব দক্ষ না হলেও একবারে আনাড়ী ছিলাম তা নয়।

সেদিন বর্ষা প্রথম নেমেছে। চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছে। কোন কিছুতই মন বসছিল না। মন চায় শুধু

আকাশের ওই মেঘখানির মত আমার দুটি চোখ বেয়ে জল ঝরাতে। কোথায় ব্যথা জানিনা। কোদালকাটির রাজপুত্রের কিসের অভাব? তবু তার অভাব আছে। বিদ্যুতের মত কিসের যেন একটা ব্যথা আমার বুকখানিকে সেদিন কতবার ছুচির করে ফাঁক দিচ্ছিল।

সাতবছর বয়ষে এ বাড়ীতে আমার প্রথম আসা। এখন আমার বয়ষ বাইশ। এই পনর বৎসরে এখানে কাউকে আমি আপনার করে উঠতে পারিনি। আমাকে আদর যত্ন করবার লোকের অভাব ছিল না সত্য—কিন্তু সে আদর যত্নের মধ্যে যেন প্রাণ ছিল না। মানুষ মানুষকে আদর যত্ন করছে, এ তো তা নয়! সব যেন যন্ত্রে হয়ে যাচ্ছে। কখন কারো কাছে কিছু চাইতে হয় না, কারো উপর রাগ করবার দরকার হয় না। কারো সাথে ঝগড়া মারামারি করবো —তারো যো নাই। একটা সমবয়স্ক ছেলের সাথে যে একটু ভাব করবো—তারো কোন উপায় ছিল না। রায় বাহাদুরকে বাবা ও কর্ত্রীকে মা বলে ডাকতাম বটে—কিন্তু তার মধ্যেও একান্ত প্রাণের অভাব। এইরূপ অস্বাভাবিক আবেষ্টনির মধ্যে থেকে আমি মাথায বাড়ছিলাম বটে—কিন্তু মানুষ হতে পারছিলাম না। আমার হৃদয় এক এক সময় যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। এতবড় বাড়ীটায় শুধু একটী স্থান ছিল, সেখানে গিয়ে আমি একটু শান্তি পেতাম। সেটি

হচ্ছে আমার পাঠাগার। সেখানে গিয়ে কেতাবের মধ্যে ডুব দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃত হতে পারতাম।

সে সময় দেশময় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বয়েছিল। আমার তরুণ প্রাণ সেই ঢেউ খেয়ে বিচলিত হয়ে উঠল। অনুকুল অবস্থার অভাবে পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় শুনলাম—আমাদের গ্রামে একজন সাধুপুরুষ এসেছেন। সাধু সন্ন্যাসীদের উপর আমার কোন কালেই শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল না। সাধু সন্ন্যাসীদেব আমি ভণ্ড জুয়াচোর বলেই জানতাম। সেই কারণে এই মানুষটীর সম্বন্ধে কোন রকম অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করিনি।

কিন্তু একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল—যাতে এঁর সম্বন্ধে শুধু অনুসন্ধান করা নয়, পরিচয় করার আবশ্যক বলে মনে হল। আমার পাঠাগারের নীচেই ছিল একটা এঁদো পুকুর। বাড়ীর ঝিরা এখানে বাসন মাজত, কাপড় কাচত—এই রকম সব কাজ করত। একদিন লাইব্রেরীতে বসে আমি রবি বাবুর একখানা নূতন প্রকাশিত বই পড়ছি—এমন সময় শুনলাম আমাদের বাড়ীর বামা ঝি আর কাউকে বলছে—"এই যে তোরা সাধুটি ভাল মানুষ নয় বলিস। আচ্ছা—এই সাধু যদি গাঁয়ে না আসত তা হলে রায়দের ছেলেটার কি দশা হ'তো? সাধুইত ন'বনে ছুনোর ছেলেকে শিখিয়েছিল বলে—অমন জলে ডুবা ছেলেকে কত

কৌশলে করে বাঁচাল!" এদের কথাবার্ত্তা থেকে যতটুকু বুঝলাম—এ সাধুটীর আগমনে গ্রামে বেশ একটা নব জাগ-রণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। বিদেশী বর্জ্জনের নেশা যেন অনেককেই পেয়ে বসেছে। আর এই সাধুর চিকিৎসাগুণে অনেক কঠিন রোগী আরোগ্যলাভ করছে। তখন বেলা বোধ হয় তিনটে। আমি মনে মনে স্থির করলাম—আজ যে কোন উপায়ে এই সাধুর সাথে দেখা করতেই হবে। আমাকে বাড়ী হতে কোথাও যেতে হলে কর্ত্তার অনুমতি নিতে হত। কর্ত্তাকে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র কি জানি কেন আপত্তি করলেন না। একটা দারোয়ান ও একজন আমলাকে আমার সাথে যেতে বল্লেন।

সাধুটীর আশ্রম ছিল ভদ্র পল্লীর বাইরে দুলে পাড়ায়, নিকটে অনেকগুলি সাঁওতালের বসতি। বাঁকা নদীর তীরে একটা ভাঙ্গা মন্দির, তার নীচে ততোধিক ভাঙ্গা একটা বাঁধা ঘাট কোন স্মরণাতীত যুগের কোন পুণ্যাত্মার উদারতার স্মৃতিটুকু এখনো যেন বুকে করে আছে। মন্দিরের প্রাঙ্গনটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একদিকে মস্ত একটা অশ্বত্থ গাছ। তার ছায়ায় একজন দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ চরকায় সূতো কাটছেন আর কি যেন বলছেন। তাঁকে ঘিরে গোল করে বসে আছে অনেকগুলি দুলে বাগদী আর সাঁওতাল। এরাও সুতো কাটছে আর লোকটীর উপদেশ শুনছে। অনুমানে

বোধ হ'ল ইনিই সেই সাধু পুরুষ। কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীর বাহ্যিক লক্ষণ বা অনুষ্ঠান কিছুই চোখে প'ড়ল না। না আছে তাঁর মাথায় দীর্ঘ জটাজুট, না আছে পরিধানে গৈরিক বসন। ধুনাও জ্বলছে না, বড় বড় গাঁজার কলকেও পুড়ছে না। সাধারণ ভদ্রলোকের মত বেশ, কিন্তু তা খদ্দরের।

আমরা মন্দিরের সীমানা মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র সাধুজি আমার দিকে একবার চাইলেন, কি নিগূঢ় অতলস্পর্শী সে চাহনি! আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে একবার চেয়ে মাটির দিকে মুখ নত করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি একটুখানি হেসে লোকদের যা বলবার ছিল ব'লে যেতে লাগলেন। আমার সঙ্গে যে আমলাটি এসেছিল সে তাঁর নিকটে গিয়ে কি যেন বল্লে, তিনি অম'ন খদ্দরের চাদরখানা বিছিয়ে আমার দিকে হস্ত প্রসারণ করে স্মিতমুখে বল্লেন "আসুন আসুন কুমার বাহাদুর বসুন এখানে এসে।" কুমার বাহাদুর! একি অদৃষ্টের পরিহাস আমার সঙ্গে! আমলাটির উপর আমার এমনি রাগ হচ্ছিল! কিন্তু তাকেত কিছু দোষ দেওয়া যায় না এ বিষয়ে। কোদালকাটীর রাজপুত্র ভুলে বাগদীদের সঙ্গে মাটিতে ব'সবে এযে কল্পনা করাও তার পক্ষে অসম্ভব।

ট্র্যাজেডী না কমেডী

সাধুজি নিজে বসে আছেন মাটির উপর আর আমার বসার ব্যবস্থা হ'ল তাঁর গায়ের খদ্দরের চাদরখানির উপর! লজ্জায় আমার মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল, সর্ব্বশরীর দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগল। আমি নিজকে কথঞ্চিৎ সংযত করে নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে· তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে তাঁর প্রশস্ত বক্ষটির উপর জড়িয়ে ধরলেন। কি মধুর সেই আলিঙ্গন! কি শীতল সেই স্পর্শ! আমার যেন মনে হতে লাগল—কত যুগযুগান্তরের বুভুক্ষু হৃদয়ের সমস্ত পিপাসার তৃপ্তি হল তাঁর এই স্নেহের পরশ মেখে। আমি কতক্ষণ এভাবে ছিলাম ঠিক জানি না! যখন জ্ঞান হ'ল দেখলাম সাধুজি ধীরে আমার মাথায় হাত বুলাচ্ছেন আর বলছেন একি ব্যাপার করে তুল্লেন বলুনত? আপনি শিক্ষিত পুরুষ মানুষ, আপনার কি এরূপ মোহাচ্ছন্ন হওয়া উচিত? আমি দুইহাত এককরে বল্লাম গুরুদেব আমার অপরাধ হয়েছে মার্জ্জনা করুন, আমার দিকে চেয়ে বল্লেন "কিসের অপরাধ কিসের লজ্জা কুমার?" আমি বল্লাম "সে কি কম অপরাধ কম লজ্জার বিষয় গুরুদেব! আপনি নিজের গায়ের খদ্দরের চাদরখানি বিছিয়ে আমার বসবার আসন করে দিলেন, আর নিজে ধুলোর উপর ব'সে অমৃত বিতরণ করছেন।" "এতেত তোমার কোন অপরাধ করা হয়নি, আর আমারও কোন অন্যায় হয়নি, তুমি এখানকার ভাবী

জমিদার আমার অতিথি, অতিথির যথাযোগ্য মর্য্যাদা রাখার আবশ্যক। কি করব বাবা এখানেত অন্য আসন ছিলনা তাই খদ্দর বিছিয়ে দিয়েছিলাম। আমার কাজ আমি করেছি তোমার কর্ত্তব্য ছিল তোমার হাতে। কিন্তু তুমি যা করেছ তাতে তোমাকে বুকে টেনে নেওয়া ছাড়া আমার আরত করবার ছিল না।" এই বলে কি এক অপরূপ স্নেহাবিষ্ট নয়নে চেয়ে আমাকে আবার বুকে চেপে ধরলেন।

মানুষের শরীরে তড়িত বয়, একথা আর কেও বিশ্বাস করুক আর নাই করুক আমার অবিশ্বাস করবার জো নাই। আমি সেই মুহূর্ত্তে কি যেন হয়ে গেলাম। একটা অপূর্ব্ব জ্যোতি আমার নয়নপথ বিভাসিত করে দিলে। জানি না লোকে কি দেখে গুরু বরণ করে। শুধু জ্ঞানের কথা শুনিয়ে বুঝি গুরু হওয়া যায় না। এই যে পুরুষটি এমনি বা কি করলেন, এমনি বা কি জ্ঞানের কথা শুনালেন, যাতে আমার সমস্ত দেহ সমস্ত প্রাণ ওই শ্রীচরণ দুটিতে বিলীন হয়ে গেল। আমি বল্লাম গুরুদেব আপনার আশ্রমটিতে পা দেবা মাত্র আমার সমস্ত প্রাণ সমস্ত অঙ্গ ছুটে যেতে চাচ্ছিল এই দুলে বাগদী ভাইগুলির মধ্যে গিয়ে বসতে। কিন্তু কোথা হতে এই ঢাকাই ধুতিখান আর সঙ্গের এই লোক দুটী যেন প্রাণপনে পিছন হতে টেনে ধরে রাখতে লাগল। দেখুন দেখি মানুষের স্পর্দ্ধা, আর

অহঙ্কার! গুরুদেব বল্লেন "সেত তুমি ঠিকই করেছ। ঢাকাই কাপড়ত সত্যি মাটিতে লুটাবার জন্য নয়। তুমিত তাও করলে। ভেবোনা এতে তোমার অন্যায় করা হয়নি কিছু। অন্যায় যথেষ্টই হয়েছে। যে যেমন জিনিষ তার তেমন মর্য্যদা রাখার আবশ্যক আছে বৈকি। না হলে আর্টকে যে পায়ে চেপে মারা হয়।" এই ব'লে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে একখানা খদ্দর এনে আমাকে পরতে দিলেন। বল্লেন—এর সূতো তাঁর নিজের হাতে কাটা আর বুনানও তাঁর নিজের। কতবড় ভাগ্যবান আমি! কাপড় খানা ছেড়ে দারোয়ানের হাতে দিয়ে বল্লাম "যাও তোমরা এখান হতে। সন্ধ্যা হ'লে আলো নিয়ে আমাকে নিতে এস। তারা চলে গেলে গুরুদেব বল্লেন "দেখ বাবা তোমার সকল ইতিহাসই আমি অবগত আছি। সত্যি বলতে কি, তোমার আকর্ষণেই আমার এখানে আসা। আমার মা যে তোমার মুখের পানে চেয়ে আছেন। নারায়ণ তোমাকে দিয়ে যে হতভাগ্য দেশের মস্ত একটা কাজ করিয়ে নিতে চান। দেখ তুমি যখন এখানে এলে আমি তোমাকে দেখে চিনতে পেরেছিলাম। ইচ্ছা হল তোমাকে পরীক্ষা করে দেখতে, পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ।" আমি বল্লাম "কই পরীক্ষাত কিছুই বুঝতে পারিনি।" তিনি বল্লেন "দেখ তুমি যদি সে সময় কি করব স্থির করতে না পেরে

ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে ছুটে এসে এদের মধ্যে বসতে তাহলে তুমি আমার যতখানি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছ তা হয়ত পারতে না। একটা কাজ যা নিতান্ত সাধারণ নয়, তা লোকে করে দুটি দিক দিয়ে; এক ভাবের প্রেরণায় আর এক যুক্তির সাহায্যে। তোমার পক্ষে এমন সব কাপড় চোপড় পরে ছুটে এসে দুলে বাগদী-দের সাথে মাটিতে বসা খুবই অসাধারণ, অনৈসর্গিক বল্লেই হয়। দুলে বাগদীর মাটিতে বসা আর তোমার মাটিতে বসা ঠিক ও এক নয়। ওদের যে মাটির সঙ্গে আজন্ম সম্বন্ধ।

আমারও মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বটে কিন্তু সে অনেক ঘোর প্যাঁচ খেয়ে। মাটি হ'তে শস্য, শস্য হ'তে টাকা, তোমার টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ। অতএব যে প্রকৃত মাটির অধিকারী আর যে টাকার অধিকারী--- এ দু'জনের মধ্যে কখনও কি মিল হওয়া সম্ভব? তুমি যে আমার নাম ডাক শুনে, অথবা অন্য কারণে মোহাবিষ্ট হয়ে—ভাবের প্রেরণায় এদের মধ্যে এসে বসনি—তাতে তোমার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। হাঁ—তারপর তুমি এদের মধ্যে একদিন বসবে, তখন তার মধ্যে ভাবের লেশমাত্র থাক্‌বে না। থাক্‌বে কেবলমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান। দেখ—মাটির সাথে গোড়া হতে পরিচয় না রাখলে পরে করা বড় শক্ত হয়। আত্ম-পরিচয় দেওয়ার সময় বোধ করি এখনো

আসেনি; তবে এই জেনো মাটির সাথে যে আমার পরিচয় ঢের দিনের—তা নয়। প্রথম তখন কি বাধবাধই না ঠেকত! অনেক সাধনা করে তবে হয়েছে; মুখে বল্লেই কি হয়?"

আমি তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বল্লাম—"গুরুদেব—আমাকে দীক্ষিত করুন, মন্ত্র দেন।" একটু হেসে বল্লেন—"মন্ত্র দেওয়া, গুরুগিরি করাত আমার ব্যবসা নয় বাবা! দীক্ষা? তাত তোমার ইতিপূর্ব্বেই হয়েছে, তবে একটা মন্ত্র চাই বটে, বৎস তোমার মন্ত্র—ত্যাগের মন্ত্র। তোমার ত্যাগ সংসারে শুধু মঙ্গল সাধন করবে। আমি জানি বৎস—তোমার ব্যথা কোথায়! আমি জানি বৎস—তার ঔষধ কি? সে কেবল ত্যাগ। তোমার নিজের পিতা-মাতা অর্থলোভে তোমাকে অপরের কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন। এই দারুণ অভিমানের ক্ষত তোমাকে পীড়া দিয়ে থাকে। সব ত্যাগ করে জন্মদাতা পিতা ও গর্ভ-ধারিণীর উপর এই অভিমানটুকু ত্যাগ করা কি এতই শক্ত? তোমার পিতৃত্যাগ ও মাতৃত্যাগ ব্যাপারের দ্বারা কি যে মঙ্গল সাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে তা ভেবে দেখতে চেষ্টা করেছ কি একবার? তোমার বাপ ছিলেন দরিদ্র যতদূর হতে হয়, তোমার মা বহু সন্তান-বতী। তাঁদের এমন সাধ্য ছিল না ছেলে মেয়েদের

শিক্ষার ব্যবস্থা করাত দূরের কথা বাঁচিয়ে বড় করে তোলেন। তোমাকে ত্যাগ করেইত আজ তাঁরা একপ্রকার সমৃদ্ধিশালী বল্লেই হয়। ছেলেরা স্কুলে কলেজে পড়ছে মেয়েদের ভাল ভাল ঘরে বিয়ে থাওয়া হচ্ছে। জোত জমা, পাকাবাড়ী সবইত হ'য়েছে। বল দেখি তবে তোমার এই ত্যাগের দ্বারা তোমার পিতৃকুলের মঙ্গল হয়েছে না অমঙ্গল হয়েছে! তিনু মুখুর্য্যের বংশ যদি এই জীবন সংগ্রামে টিকে থাকে তবে তা তোমার এই ত্যাগের দ্বারাই জানবে। পিতৃ ঋণ এমন করে পরিশোধ করার সুযোগ কজনেরই বা হয়? নারায়ণের কি অদ্ভূত ইচ্ছা, তিনি তোমার ত্যাগের দ্বারা কত মঙ্গলই না ঘটাবেন!" আমি বল্লাম "আমার আপন পিতা মাতার ঋণ না হয় শোধ হ'ল কিন্তু যাঁরা আমাকে গ্রহণ করে এত বড় করে তুল্লেন তাঁদের ঋণত আছে!" গুরুদেব বল্লেন "আছে বৈকি, আর সে ঋণও বড় সামান্য নয়!" আমি বল্লাম "সে ঋণ পরিশোধ করি কি করে?" তিনি বল্লেন "তাঁরা তোমাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছেন কেন? না—তাঁদের বিষয় আছে কিন্তু বংশধর নাই। তাঁদের নামটা সংসার হতে যাতে একবারে লোপ না পায় তারই জন্য। তোমার কর্ত্তব্য তাঁদের নাম যাতে বাস্তবিকি লোপ না পায় তারই ব্যবস্থা করা। তার

সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় আমার এই মনে হয় তাঁদের কাছে হ'তে তুমি যে সব বিষয় সম্পত্তি পাবে, তাই দিয়ে এমন সব সদনুষ্ঠান করা যাতে বাস্তবিকি আমাদের দেশের মঙ্গল সাধিত হয়। বৎস ত্যাগই তোমার মন্ত্র, তোমার অন্য মন্ত্র নাই।" এমন সময় দরোয়ানটা আসায় সে দিনের মত বিদায় হ'লাম।

রাতে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুমাতে পাল্লাম না। কেমন একটা অসহ্য পুলক আমার সমস্ত শরীর রিম ঝিম ক'রে দিতে লাগল। আমার এতদিনের ব্যথা, এত দিনের সমস্যা গুরুদেব আজ এক নিমেষে দূর করে দিয়েছেন। তাঁহার মুখারবিন্দ স্মরণ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখি বেশ একটু বেলা হয়েছে। দীর্ঘ দুর্য্যোগ রজনীর অবসানে ঘুম হতে জেগে উঠলে যেমন হয় আমারো ঠিক সেই রকম বোধ হ'তে লাগল। কে যেন একখানা জগদ্দল পাথর আমার বুক হতে সরিয়ে দিয়েছে। এত বৎসর পর এ স্থানটাকে যেন আপনার মনে হতে লাগল। তখন যাকে দেখি আপনার মনে হয়। রায় বাহাদুর ও কর্ত্রীকে নিজের বাপ মায়ের চেয়ে কম আপনার বলে মনে হল না।

সেই হতে প্রতিদিন আশ্রমে যেতাম আর কত রকম জ্ঞানের কথাই না শুনতাম। একদিন সকাল বেলা

দৈবাৎ সেই বারান্দায় উপস্থিত হই যেখান হতে এক-দিন ময়ূরের নাচ দেখেছিলাম। সেখানে যাবামাত্র আবার দাদার কথা মনে পড়ে গেল। অমনি আমার নির্ব্বাপিত বিদ্রোহানল ধূ ধূ করে পুনরায় জ্বলে উঠল। আমার সেই স্নেহময় দাদার মৃত্যুর কারণ মনে করে নিজকে কতবার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করল।

গুরুদেবকে আমার সে সময়কার মনের ভাব নিবেদন করায় তিনি বল্লেন "এই দেখ যে বিষয়ে তোমার কিছু মাত্র দোষ নাই, অথচ নিজেকে অপরাধী মনে করে মিছামিছি মন খারাপ করছ! কে বল্লে তোমার দাদার মৃত্যুর কারণ তুমি? তার মৃত্যুর কারণ তার বাপ মা, আর সে নিজে। তার বাপ মার দোষ—কেন তাঁরা এই পাগলা ছেলেটাকে বাড়ীর বা'র হতে দিলেন? তার নিজের দোষ এই জন্য—দশ বছরের ছেলে বুদ্ধি যে কিছু না হ'য়েছে তা নয়, তবে যাস তুই কেন অমন দুপুর রৌদ্রে তোর ভায়ের সন্ধান করতে? তুমি বলবে স্নেহের টানে। স্নেহের টান কথাটা শুনতে বেশ, কিন্তু আসলে ও জিনিসটার মূল্য কতখানি সে বিষয়ে আমার মনে ঘোরতর সন্দেহ আছে। তোমার কথাই যখন উঠেছে তখন তাই নিয়েই আলোচনা করা যাক। আচ্ছা তোমাকে পোষ্য দিবার পূর্ব্বে তুমি কি ভুলেও একবার

মনে করতে পারতে তোমার মা তোমাকে স্নেহ করেন না। সব ছেলেই যেমন ব্যথা পেলে মায়ের কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুমিও তাই করতে, আর সে ব্যথা কোন মোহন মন্ত্রবলে তখনি বিদূরিত হ'য়ে যেত। সেই স্নেহময়ী মা তোমার স্বার্থের জন্য অপরের কাছে তোমাকে বিকিয়ে দিয়ে দিব্য মনের সুখে সংসার যাপন করছেন। এ যদি সম্ভব হয়—কে ব'লতে পারে স্নেহময় ভাই বড় হ'য়ে একদিন স্বার্থের জন্য তোমার গলায় ছুরী বসাতে না পারত? ছুরী বসান শুনে মনে মনে হাসছ বুঝি! সত্যই ভাই ভায়ের গলায় ছুরী বসায়। ইতিহাসে তার বিস্তর নজীর দেখতে পাবে। আর অত দূরেই বা যাবার কি আবশ্যক? বাঙ্গালার যে কোন একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইতিহাস দেখ—ওই একই করুণ কাহিনী। ভাই ভায়ের গলায় ছুরী মারে,—তবে তফাৎ, কোথাও বা সত্য সত্য ছুরীর আঘাত আর রক্তপাত, আর কোথাও বা আঘাত আছে—কিন্তু ছুরী দিয়েও নয়, রক্তপাতও নাই। সে যে বড় কঠিন আঘাত! দেখ, স্নেহ জিনিষটা আসলে পশুর ধর্ম্ম; পশুতে স্নেহ করে, মানুষে ভালবাসে। আমাদের বৃহৎ পরিবার, শৈশবে যে কখনও কারো বিশেষ স্নেহ পেয়েছি সে কথা কই মনে ত পড়ে না! অথচ ওই এক পরিবারে আমার সমান বয়সী জেঠতুতো ভায়ের

কখনো স্নেহের অভাব হয় নি; কেন না তিনি কর্ত্তার বড় ছেলে। স্নেহ যে পাইনি সে আমার পরম ভাগ্য। স্নেহ জাতীয় জিনিসের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ভালবাসাতে। তাই আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, পুত্র কন্যাদের ভালবাসি। তারা ভুলেও আমাকে এ অপবাদ কখনো দিতে পারে না যে আমি তাদের কোন দিন স্নেহ করেছি। স্নেহ পাশব ধর্ম্ম, এর পরিবর্ত্তন হয়—ক্ষয় হয়; ভালবাসার ক্ষয় নাই—পরিবর্ত্তন নাই। দেখেছত বাছুরটা যতদিন ছোট থাকে, ততদিন গাইটার তার প্রতি কত স্নেহ! কিন্তু বাছুরটা যেই একটু বড় হয়, সব স্নেহ কোথায় উড়ে যায়। মানুষের দৃষ্টিতে যা একেবারে অসম্ভব, কালে সে সম্ভাবনাও দাঁড়াতে পারে। মানুষের ততদূর না হোক, রূপান্তর অনেক রকম দেখা যায়। তাই বাপ বেটায় মুখ দেখাদেখি থাকে না, ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি আর মারামারি, ভগ্নীতে ভগ্নীতে রেষারেষি আর কেশাকেশি। অথচ এরাই একদিন একই স্নেহনীড়ে কেমন স্বচ্ছন্দে মনের সুখে বাস করেছে। দেখ এ বিষয়ে তুমি কি ভাগ্যবান! তোমার দাদার স্নেহ স্বার্থপরতার কালি মেখে বিকৃত হবার অবসর পেল না। আর আমি—যাক সে কথা!"

আমি বল্লাম—"আমিত কায়মনবাক্যে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আমার কাছে আপনার এমন কি গোপনীয় থাকতে পারে প্রভু?"

গুরুদেব বল্লেন—"না, তোমার কাছে আমার কোন কথাই গোপন থাকা উচিত নয়। দেখ, আমার সম্বন্ধে যেন ভুল বুঝো না। ভেবো না, সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমি এ পথ অবলম্বন করেছি। সংসারে অনুরাগ কারো চেয়ে আমার কম নয়! আমি সংসারের ঋণ সেবার দ্বারা, স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে এসেছি। শুধু একজনের ঋণ শোধ করতে পারিনি—পারব বলে মনেও হয় না। কিন্তু আমার মায়ের ঋণ—তার যে অনেক বাকী; মনে পড়ে সেদিন, তখন আমার বয়স দশ এগার বছরের বেশী নয়, বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠ আমাদের বাড়ীর চিলে-কোঠায় বসে প্রথম পাঠ করি। সেই দিন বুঝি, মা আমার কত কাঙ্গালিনী! সংসারে নানা ক্ষেত্রে নানা কাজ করেছি—সে সবই মায়ের কাজ মনে ক'রে। আমি ভালবাসতাম—নবসূর্য্যালোকদীপ্ত আমাদের পরিবারের সেই প্রভাবটী, আমি ভালবাসতাম—তার দীপ্তোজ্জ্বল মধ্যাহ্নটী, আর ভালবাসি তার অস্তকালীন শেষ রক্তরাগটী। আমি ভালবাসতাম ধনী নির্ধন, আত্মীয় স্বজন, শত্রু মিত্র। সকলকে সেবাও করে আসছি

প্রাণ মন দিয়ে—সে যে মায়ের সেবা! যত ভালবেসেছি, ব্যথাও পেয়েছি তেমনি—ঘরে ব্যথা পেয়েছি, বাইরে ব্যথা পেয়েছি। সেও মায়ের দান মনে করে মাথা পেতে নিয়েছি। দেখ দেখি অদৃষ্টের পরিহাস। সে দেশে দশ ক্রোশের মধ্যে এমন কোন পরিবার ছিল না কর্ম্মসূত্রে যাদের সাথে আমাদের তিন পুরুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না! আর আজ আমার নাম রাজদ্রোহী স্বদেশী ডাকাত-দের দলে! সে সবই ত সহ্য করে কর্ত্তব্য-পথে চলছিলাম! কিন্তু শেষে যে আঘাত পেলাম—এমন স্থান হ'তে, আর এমন অবস্থায়, যা সহ্য করে এখনো যে দেশের কাজ করতে পারব বলে আশা করছি, এ কি ভগবানের কম অনুগ্রহ আমার উপর! দেখ, বাংলা দেশে বেশ সম্ভ্রান্ত বংশে আমার জন্ম। সংসারে মানুষ যা কিছুর গর্ব্ব করে, আমাদের পরিবারে তার কোনটীরই অভাব ছিল না; বিষয় সম্পত্তি, লোকজন সকলই ছিল। আমাদের পরিবারটীকে বাংলা দেশের একটী বড় আদর্শ পরিবার বলা যেতে পারত। আমার সবচেয়ে বড় পাপ কি হয়েছিল জান? আমি আমাদের পরিবারের বড় গর্ব্ব করতাম। আমার বাপ মা যেমন ছিলেন—সাধারণতঃ বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের মত ভ্রাতৃভাবও সংসারে একান্ত বিরল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রেরাও সুশিক্ষিত এবং

বাহিরে বিনয়ী ও সুশীল বলেই প্রতীয়মান হ'ত। আমার মনে হ'ত আমাদের পরিবারটী বাংলা দেশের অন্যান্য পরিবার হতে যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পারিবারিক গর্ব্ব—শুধু ওই একটী-মাত্র গর্ব্ব আমার সমস্ত মন যেন জুড়ে বসেছিল। এ পাপের প্রায়শ্চিত্তও যা পেতে হল সেও বড় সামান্য নয়; সকল গর্ব্ব মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ভ্রাতৃগর্ব্বের সাথে আমার দেবোপম পিতৃমাতৃ-গর্ব্বও লুপ্ত হয়ে গেল। সে কি কম কষ্টের কথা! যেখানে যাই, ওই এক কথা—'আপনাদের আদর্শ পরিবারের মধ্যে'—ইত্যাদি। আমি তাদের বলি—খুব সুমিষ্ট ফলও ত পচে। পচাটুকু বাদ দিয়ে ভালটুকু ব্যাবহার করা যে না চলে এমন ত নয়! আমাদের মধ্যে যেটুকু পচেছে সেই টুকুই না হয় বাদ দেও, সমস্তটা ফেলে দিয়ে কি কাজ? আমাদের পুরাপুরি উন্নতির সময় অকস্মাৎ বংশে এক দিক দিয়ে ভাঙন আরম্ভ হ'ল। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি ও চা বাগান দেখার ভার নিয়েছিলেন যে সকল দাদারা, তাঁরা একে একে স্বর্গবাসী হ'লেন। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি দেখার ভার নিলেন আমাদের দু'টি ভ্রাতুষ্পুত্র, আর চা বাগান—যেটি আমাদের সব চেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি—সেটির ভার নিলেন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হাঁ, গর্ব্ব করার মত ভাই বটে—প্রিয়দর্শন, সুপণ্ডিত, বেশ একটা মোহনকারী

শক্তি ছিল তার প্রশস্ত চোখদু'টিতে! আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের কিসে মঙ্গল হয়, সে বিষয়ে কত কথাই না তার মুখে শুনেছি! আমার ভ্রাতুষ্পুত্রদের কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁরই হাতে ছিল। কাজেই নিশ্চিন্তমনে দশের সেবা, দেশের সেবা ও আমাদের বৃহৎ পরিবারের সেবায় লেগে পড়েছিলাম। স্বদেশী মন্ত্র নিয়েছিলাম আমরা একই সময়ে।

কত কথাই শুনলাম আমার এই ভাইটি ও ভাইপো দু'টির বিরুদ্ধে! কিন্তু স্নেহ ও পারিবারিক গর্ব্ব আমাকে একেবারে অন্ধ করে রেখেছিল। একবার দেশে এলে আমার ভাইয়ের মুখ দেখে আমার মনে বড় ভয় হ'ল—তাঁর মুখে কেমন সব ক্রূরতার লক্ষণ, আর চোখে কুটিলতা যেন স্পষ্ট ফুটে রয়েছে দেখলাম। তাঁকে পূর্ব্বের মত সকলের সাথে মিশতে দেখলাম না—কেমন যেন দূরে দূরে থাকবার চেষ্টা। একদিন তাঁর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—নূতন দু'টো চা বাগান, যা আমাদের ষ্টেট থেকে খরিদ করা হ'য়েছে, সে দু'টি নাকি তোমার নিজের, আর আমাদের অন্যান্য সম্পত্তি নাকি দেনার দায়ে আবদ্ধ? বোধ হয় মুখে 'আমার' বা 'হাঁ' বলতে বাধবাধ ঠেকছিল, তাই চোখ বুজে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলেন, কথাটা সত্য। আমার সমস্ত অহঙ্কার সেই মুহূর্ত্তেই

বিচূর্ণিত হ'য়ে গেল। এ আঘাত সামলাতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'য়েছিল—ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাও সামলে নিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তবে এলেন কেন দেশ ছেড়ে এ দেশে?" গুরুদেব বল্লেন—"ওখানে যতদিন কিছু দেওয়ার ছিল, দিয়েছি। এখন ওখানকার কর্ম্মক্ষেত্র আমার পক্ষে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়েছে। তাই এলাম এখানে, এদের দিয়ে যদি মায়ের কাজ কিছু করিয়ে নিতে পারি। এখানকার কাজ শেষ হ'লে, চলব আবার কোন অচিন দেশের উদ্দেশ্যে।"

আমাদের রামভদ্র হাতীটাকে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছিল শম্ভু মাহুতের আট বছরের নাতি কেষ্টা। গুরুদেব দেখে বল্লেন—"দেখ দেখি তামাসা! এতবড় জানোয়ার যার তুল্য শক্তি কোন জানোয়ারের নেই, তাকে কিনা ইচ্ছামত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সামান্য একটা ছেলে! পরাধীনতা মানুষকেও এমনি করে নির্জীব করে তুলে। এই হাতী জানোয়ারটা আমার চোখে কি মনে হ'চ্ছে জান—ওটা পুরুষ নয় নারী। ঠিক আমাদের ঘোষাল ঠাকুরটীর মত!" এমন সময় দু'টি একটী করে ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হতে লাগলেন। ওঁরা এক সময়ে গুরুদেবের বিপক্ষ ছিলেন, এখন তাঁর ভক্ত শ্রেণীর মধ্যে। গুরুদেব বল্লেন— "হাঁহে নরেন, তোমাদের ঘোষাল মশায়ের খবর কি বলত? সেদিন

শ্রাদ্ধ ওখানেই থামল, না আরও কিছুদূর গড়িয়েছিল ?"

নরেন বল্লে—"আপনিও যেমন, ঘোষাল আবার একটা মানুষ নাকি ? মেয়ে মানুষের অধম বল্লেই হয়। দেখলেন ত সেদিনকার ব্যাপার ! ঘোষাল এমন অন্যায়ই বা কি করেছিল ? সে দশজনের মত এসেছিল আপনার উপদেশ শুনতে। ঘোষাল-গিন্নির আর তা কিছুতেই সহ্য হ'ল না। গলায় কাপড় দিয়ে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে গেল আপনার সম্মুখ হতে। দেখেছেন ত ঘোষাল-গিন্নিটিকে ! তালপাতের সেপাই ব'ল্লেই হয়। বিধাতা পুরুষ করতে গিয়ে ভুলে নারী করে ফেলেছেন ! আমরা ত গিয়ে দাদাকে ঘোষাল-গিন্নির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলাম আমাদের আড্ডাতে। নানা রকমে তাকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলাম। শেষে আমাদের কাছে। প্রতিজ্ঞা করল—বাড়ীতে গিয়ে বৌকে দশটা কড়া কথা নিশ্চয় শুনিয়ে দেবে। ঘোষাল বিদায় নিলে, আমরাও তামাসা দেখবার জন্য তার পিছু নিলাম। বাড়ীতে পা দিবা-মাত্র জগদম্বা ঠাকরুণ স্বামীকে যে ভাবে ও যে ভাষায় অভিভাষণ করলেন, সে কথা আর না তোলাই ভাল। আমরা ভেবেছিলাম, দাদা এ সুযোগ নিশ্চয় ছাড়বে না। কিন্তু শেষটায় যা দেখলাম তাতে হাসি চেপে রাখা শক্ত হ'য়ে পড়ল।"

গুরুদেব বল্লেন—"কি রকম শুনি।"

"ঘোষাল ঠাকুর আহারে বসেছেন। গিন্নি পাশে বসে পাখা দিয়ে হাওয়া কচ্ছেন আর মধ্যে মধ্যে সদ্য-তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত ওষ্ঠদ্বয় কি পরিমাণ রঞ্জিত হয়েছে তারই পর্য্যবেক্ষণ করছেন। আহারের পর ঘোষাল-গৃহিণী একটা কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে এসে বৈঠকের উপর একটা রূপো বাঁধান হুঁকো ছিল তারই মাথায় সেটা বসিয়ে দিলেন; আর ঘোষাল হৃষ্ট মনে হুঁকোয় টান দিতে দিতে বল্লেন—"তা জান গিন্নি, আজ একটা ইয়ে হয়েছে, ভারি মজা হয়েছে। ওরা ত বাস্তার মধ্য হতে তোমার হাত থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওদের আড্ডাতে—তুমি হতাশ নয়নে বাড়ী ফিরে এলে। আমাকে কি ভুজঙ্-ভাজঙ্ই না দিলে ওরা তোমাব বিরুদ্ধে। বল্লে কি গিন্নি শোন—আমি এসে তোমাকে দু'ঘা লাগিয়ে দি' আর কি।" জগদম্বা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"আর তুমি কি বল্লে?"

ঘোষাল বল্লে—"আমি—আমি ওদের কথায় ইয়ে—" এই বলে তাড়াতাড়ি হুঁকোটা বৈঠকে রেখে তক্তপোষ হ'তে নেমে মাজা দুলিয়ে নাচ জুড়ে দিলেন আর বুড়া আঙ্গুলটী দেখাতে লাগলেন। জগদম্বা ঘোষালের ধাত ভালই জানেন; এক তাড়া দিয়ে বল্লেন—"বল বল, কি কথা বলেছিলে—আমার খুব নিন্দে করেছিলে, নয়? বল বল

শীগ্‌গীর বল; নইলে আমি যে কেমন জগদম্বা, এখনই টের পাইয়ে দেব!"

ঘোষাল একগাল হাসতে হাসতে বল্লে—"গিন্নি, তুমি কি অন্তর্যামিনী?—ঠিক ধ'রে ফেলেছ। হাঁ, খুব নিন্দে করে-ছিলাম। তা না হলে শালারা কি ছেড়ে দিত মনে কর?" ঘোষালের দেহটা ছিল কিছু অতিরিক্ত-রকম স্থূল। আহারের পর নেচে আর জগদম্বা ঠাকুরাণীর তাড়া খেয়ে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হ'য়ে তক্তাপোষে বসে হাঁপাতে লাগলেন, আর জগদম্বা ঠাকরুণ একখানা পাখা নিয়ে তাঁকে হাওয়া করতে আরম্ভ করলেন। আমরা এই দেখে বাড়ী ফিরে এলাম।"

গুরুদেব বল্লেন—"বেশ সুখী পরিবার—কি বল?" হীরেন গাঙ্গুলী বল্লে—"তা এক হিসাবে সুখী বৈকি! কখনো ত অমিল দেখলাম না!"

গুরুদেব বল্লেন—"আর তোমাদের সান্যাল দম্পতি—এদের মধ্যে মিল কেমন?" চাটুয্যে মহাশয় বল্লেন—"ঐ দেখুন আর এক তামাসা! সান্যাল মশায় মূর্খও নন পেটে কিছু বিদ্যে না আছে এমন নয়। দেখেছেন ত আলাপ করে বেশ ভদ্রলোক নিরীহ গোছ মানুষটী! তাঁর পরিবারটিও লোক কিছু মন্দ নয়—এই আমাদের ওঁদের কাছে শোনা। অথচ দু'জনের মধ্যে মিল একদিনের জন্যও দেখলাম না।

ট্র্যাজেডী না কমেডী

গুরুদেব বল্লেন—"সেদিন এখানে একদল বাইনাচ এসেছিল দেখছিলে? এই আমার আশ্রমেই একদিন গান হ'য়ে গেল। তাতে গ্রামে আমার ভারি নিন্দে রটেছিল। কি ক'রব বল—অত করে ধরলে! অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। মনে হ'ল আমাকে গান শুনিয়ে যদি আনন্দ পায়—পাক না! সুনামে দুর্ণামে কি আসে যায়? ওরা ক'দিন আশ্রমের কাছেই ছিল। দলের লোকগুলো ওই বাইজীটাকে কি ভয়ই না করত! ওদের সাথে একটা বছর আঠারো বয়েসের ছেলে ছিল—দেখেছিলে? ছোঁড়াটার আবার কি শাসন বাইজীটার উপর। বাইজীটা ঐ ছোঁড়াটার কাছে কেঁচো যেন। আমি ভেবেছিলাম ছোঁড়াটা মেয়েটার ছেলে হবে বুঝি; পরে জানলাম ছেলে নয়—স্বামী। ওদের দেখে শুনে মনে হ'ল ওরাওত বেশ সুখে ঘর করছে। আচ্ছা—এমন হয় কেন বলতে পার? সান্ন্যাল দম্পতি দু'জনে এত ভাল লোক হ'য়েও সুখের দাম্পত্য জীবন হ'ল না। আর তোমার ঘোষাল দম্পতি ও বাইজী দম্পতি—স্বামী-স্ত্রীতে এত পার্থক্য, অথচ এত মিল। দেখ একরকম ক্রিমি আছে তাকে বলে Tape-worm (টেপ-ওয়ার্ম)। যে সব লোক গরু কি শুয়োর খায় তাদের কারো কারো পেটে থাকতে দেখা যায়। লম্বা ফিতের মত দেখতে। এদের একটা বিশেষত্ব পুরুষ ও স্ত্রী পৃথক পৃথক

দেহে থাকে না—এক দেহেতেই বর্ত্তমান। কি আশ্চর্য্য অনন্ত যুগল মিলন! এদের মত Hermaphrodite (হার্মে-ফ্রোডাইট) ক'রে বোধ হয় বিধাতা প্রথমে মানুষকেও সৃষ্টি করে থাকবেন। শুনেছি বাবা আদমের ক'খানা পাঁজরা নিয়ে শ্রীভগবান মা-ঈভকে বানান। কথাটার মধ্যে কিছু সত্য আছে। মানুষ যখন সৃষ্টি হয়, বোধ করি পুরুষ-স্ত্রী অঙ্গে অঙ্গে লিপ্ত ছিল। তখন যুগলে-যুগলে ভিন্ন আলাদা-আলাদা নরনারী দেখবার উপায় ছিল না। তখনকার মানুষদের কিছুই করতে হতো না। খেতো যে কি ঠিক বলতে পারি না। এখন যে সব Hermaphrodite জীব দেখতে পাওয়া যায়, তারাত সব Parasite—অপর কোন জীবের দেহ আশ্রয় করে থাকে। এদের সংসারে কোন কাজ নাই, চিন্তা নাই। আছে শুধু যুগল মিলনের আনন্দে বিভোর হ'য়ে থাকা। মানুষও বোধ হয় সে সময়ে অন্য কারো Parasite ছিল, বোধ হয় দেবতাদের। বিধাতা পুরুষের অনুরোধে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর মানব-দম্পতির ভার ব'য়ে ব'য়ে দেবতারা শেষে হাঁপিয়ে উঠলেন। তখন স্বর্গের পার্লামেন্টে স্থির হ'ল—এদের তফাৎ তফাৎ ক'রে না দিলে অন্নচিন্তাও আসবে না, অপরের আশ্রয় ত্যাগ করবার প্রবৃত্তিও জন্মাবে না। বিধাতা পুরুষ একখানা তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরী দিয়ে মেয়ে পুরুষকে তফাৎ করে দিলেন। তাতেইত আমাদের শাস্ত্রে

ট্র্যাজেডী না কমেডী

স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে—আর সাহেবরাও নাকি শুনেছি মেম্‌সাহেবদের better-half বলেন। নরনারীর আকর্ষণটা কেমন জান—যে যার অর্দ্ধাঙ্গ তাকে খুঁজে বের ক'রে যুগল মিলন করা। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার—যে সে নর যে সে নারীকে বিয়ে করে যুগল মিলন করতে পারে না কেন? তার জবাবও আছে চমৎকার। বিধাতা পুরুষ যে সময়ে মেয়ে-পুরুষকে তফাৎ করবার জন্য ছুরী চালাতে থাকেন, তখন primary sexual characters অর্থাৎ লিঙ্গ-বিভাগ কালে ছুরীখানা ঠিক মাঝামাঝি সরল ভাবেই টেনেছিলেন। যত গোল হ'ল secondary sexual characters বিভাগ করবার সময়। সে সময় তাঁর হাত বুঝি কেঁপে গিয়ে থাকবে, হয়ত ইচ্ছে করেই কাঁপিয়ে থাকবেন—বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য। আর এও কিছু অসম্ভব নয়—রক্ত দেখে তাঁর হাত কেঁপে গিয়ে থাকবে। কেননা বিধাতার কাজ—সে ত সর্জ্জন, কর্ত্তন নয়। যাই হোক তার ফল এই হল যে—তার পর হতে জগতে বিশুদ্ধ নর, যার মধ্যে নারীর একটুও ভেজাল নাই, এমনটি আর সম্ভব হ'ল না। যত বড় শর্ম্মাবাম পুরুষই হোন না—একটু ভাল করে দেখো, একটু খেয়ালী ভাব পাবেই পাবে—হয় চুলে, নয় চোখে, নয় চলাফেরার রকম-সকমে, নয় কথাবার্ত্তার ধরণ ধারণে কিছু না কিছু নারীত্ব থাকবেই থাকবে। আর

যতই কেন শান্ত শিষ্ট গোবেচারা মেয়েমানুষই হোন না, পুরুষের লক্ষণ, রকম সকম একটু আধটু, হয় চেহারায়—নয় আর কিছুতে আছেই আছে। একটা অঙ্ক দিয়ে বোঝান যাক—দম্পতি = জায়া + পতি = নর + নারী = ১ + ১ = ২। সুখের দাম্পত্য জীবন মানে স্ত্রী ও পুরুষের যত কিছু নারীত্ব ও নরত্ব তার যোগফল হওয়া চাই এক পূর্ণ নর ও এক পূর্ণ নারীর যোগফল অর্থাৎ ২। যে সে নরের সাথে যে সে নারীর মিলন ঘটিয়ে দিলে আসলে যদি ১ + ১ = ২ না হয়, তা হ'লে সে মিলন মিলনই নয়। হয় স্ত্রীত্বের ভাগ কম প'ড়ে পুরুষত্বের ভাগ ফাজিল হবে, নয়ত পুরুষত্ব কম প'ড়ে স্ত্রীত্ব ফাজিল হ'য়ে দাঁড়াবে। এমন হলে কি আর যুগল মিলন সম্ভব! তোমাদের ঘোষাল দম্পতির দৃষ্টান্ত এখানে কাজে লাগাতে পারা যায়। মনে কর ঘোষালের মধ্যে আছেন ৩/৪ পুরুষ, ১/৪ নারী। এখন ঘোষাল ঠাকুর যদি সুখের দাম্পত্য লীলা করতে চান, তবে তাঁর ঐ জগদম্বা ঠাকরুণটীকে বিয়ে করা ছাড়া অন্য পথ ছিল না ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে দেখবে—জগদম্বার মধ্যে আছেন ৩/৪ নারী, ১/৪ পুরুষ, ঘোষাল ঠাকুরের ঠিক complement আর কি! যোগ দেও ঠিক ২ হবে। একটু সভ্য জাতিদের বিবাহের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—যে যার complement তার সঙ্গে জুটে যাওয়া। ইংরাজদের মধ্যে বিয়ের আগে

courtship চলে। এর উদ্দেশ্য complement এর উদ্দেশ্যে অভিযান বই আর কি বলা যায়? মন্দ প্রথা কি করে বলি? তবে পরীক্ষায় টিকলো না। ডাইভোর্স কোর্টের ও আর আর বিষয়ের statistics দেখে তাইত মনে হয়। আরে বাবা—অত সহজে যদি complement খু'জে বের করা সম্ভব হতো তা হলে আমাদের কালাচাঁদ ঠাকুরটিকে ষোড়শ সহস্র গোপিনী ঘেঁটে রাধাকে খুঁজে বের করতে হ'ত না। রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলন। কি grand idea বৈষ্ণব ঠাকুরদের! বিধাতার উপর টেক্কা দেওয়া। কত যুগ যুগান্তরের বিরহের চির নির্ব্বাসন। হিন্দুরা বিষয়টা আরও গভীরভাবে নিয়েছিল। সেকালে courtship প্রথা অন্ততঃ রাজরাজড়াদের ঘরে একেবারে না ছিল তা নয়। স্বয়ম্বর সভার আহ্বান—সেত রাজকুমারীদের complement খুঁজে বের করার ব্যবস্থা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? প্রথাটা চ'লল না—ভালই হয়েছে। ভাগ্যে রাজরাজড়াদের ঘরে একটার বেশী মেয়ে হওয়ার কথা শুনতে পাওয়া যায় না। আমাদের মত গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে পার করতে হ'লে স্বয়ম্বর কথাটা অভিধানেই থেকে যেত, হ'য়েছে কোথাও তা বড় একটা শুনা যেত না। তবে একটা কথা—তখনকার রাজারা সকলেই নাকি ছিলেন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর। তারপর complement খোঁজার যা ব্যবস্থা ছিল আজও হিন্দু সমাজে কতকটা তাই দেখতে

পাওয়া যায়। ঘটক লাগান, কুলশীল প্রভৃতি দেখা, ঠিকুজী-কোষ্ঠি মিলান, হাঁচি-টিকটিকি মানা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ রকম বিয়ের ফল ইংরাজদের চেয়ে ভাল কি মন্দ ঠিক বলা বড় কঠিন। কেননা এখানেত ডাইভোর্স কোর্টের statistics মিলাবার উপায় নাই। তবে বিদেশীরা নাকি বলেন—হিন্দু দাম্পত্য জীবনে সুখের মাত্রা নাকি তাঁদের দেশের চেয়ে অনেক বেশী। তা হতে পারে। কিন্তু যতই হোক, এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলতে পারে বলে মনে হয় না। ও হ'ল এক গলা জলে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা। না পাওয়াই বেশী সম্ভব, তবে পাও যদি সে ভাগ্য বরাত! আমার কি মনে হয় জান? বর্ত্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা নর-নারী কি ক'রে নিজের নিজের complement (পরিপূরক) চিনে বার করে তাই স্থির করা। এ সমস্যার যেদিন মীমাংসা হবে, সংসারে আর সব ছোট বড় সমস্যা সেই দণ্ডেই দূর হয়ে যাবে—এমন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা স্থাপনের আর দ্বিতীয় উপায়টী খুজে পাবে না। কে বলতে পারে, তোমার ছেলের complement ইউরোপের কোন এক রাজকুমারী ছিল কি না? Complement খুঁজে বের করা চাইই—যেমন করেই হোক। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এটাত একটা মুখের কথা নয়। এ স্থাপনের একমাত্র উপায় complement খুঁজে বিয়ে করা। অর্থাৎ যার সাথে

যার মজে মন। 'মজে মন' এর অর্থ এ নয়—রূপ অথবা অর্থ দেখে ভুলে যাওয়া। ওর আসল মানে হ'চ্ছে—complementএর সাথে জুটে যাওয়া আর কি। হিন্দুদের জ্যোতিষ শাস্ত্রটা ঠিক আছে কিনা জানিনা, সময় সময় তাক লাগিয়ে দেয় বটে, কিন্তু মনকে মানাবার মত কারণ যে দেখি না। হায়রে! জ্যোতিষ শাস্ত্রটা যদি নির্ভুল হ'ত আমি হু'দিনেই পৃথিবীতে শান্তি-রাজ্য স্থাপন করতে পারতাম। লেগে যেতাম যত ছেলে-মেয়ের ঠিকুজী নিয়ে ঘটকালী করতে। আমার চেষ্টায় জগতে একটা অখণ্ড মানবজাতির অভ্যুদয় হ'তে পারত। গত মহাযুদ্ধের পর জগতে কি করে শান্তি স্থাপিত হতে পারে সেই চিন্তায় নাকি মহা মহা পণ্ডিত ভেবে সারা হচ্ছেন শুনতে পাই! লীগ অফ নেশনস্ (League of Nations) এই নিয়ে নাকি আদা জল খেয়ে নেমেছেন, আর টাকাও খরচ হচ্ছে জলের মত। ফল যা হবে তা বুঝতেই পারা যাচ্ছে—স্বাধীন নৃপতিগণের মানুষ মারার যন্ত্রপাতির অসম্ভব বৃদ্ধির পরিমাণ দেখে। এঁরা তা না করে এমন একটা আইন করুন না কেন—যাতে মানুষ নিজের complement ছাড়া যেন আর কাউকে বিয়ে করতে না পারে, আর টাকাগুলো অমন করে জলে ফেলে না দিয়ে আচার্য্য বসুকে দিয়ে এমন একটা যন্ত্র বানিয়ে নেন না কেন—যা দিয়ে কে কার complement

এক নিমিষে ধরা পড়বে। এমন sensitive যন্ত্র তৈরী করার মত মাথা যদি কারও থাকে তবে সে ঐ মহাত্মারই আছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন—"আজ সকাল হতে মনের ভিতরটা কেমন যেন করছিল—তাই তোমাদের সাথে একটুখানি রহস্যালাপ করলাম। এ সব সত্যি সত্যি আমার মনের কথা বলে ভুল করে বস না।" পথে যেতে যেতে আমার মনে হচ্ছিল—গুরুদেবত এটা রহস্য বলে শেষটায় উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু এর রহস্য যে কোথায় আমিত বুঝতে পারছি না।

বাড়ী গিয়ে দেখি কিসের একটা ব্যস্ততা লেগে গিয়েছে। বৈঠকখানা ঘরটী ঝাড়া মোছা হচ্ছে। আমি উঠবা মাত্র কর্ত্তা আমাকে ডেকে পাঠালেন। গেলে বল্লেন—বিকালে বাড়ী ছেড়ে কোথাও না যাই, আমাকে দেখতে আসবে। কেন দেখতে আসবে জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন—হলুদবেড়ের জমীদারের মেয়ের সাথে আমার বিবাহ স্থির হ'য়ে গিয়েছে। কন্যাপক্ষ আজ আশীর্ব্বাদ ক'রতে আসবে। এই বলে আমাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে সেখান হতে উঠে গেলেন। আমি আমার ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম, শেষে এই স্থির ক'রলাম—এখন বিয়ে নিয়ে গোল করে কাজ নাই, বিয়ের সময় দেখা যাবে—সেত আমার হাতে।

বিকালে মেয়ের দাদারা এসে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে গেল। একটা দামী রিষ্টওয়াচ আমার হাতে পরিয়ে দিল। ওরা চলে গেলে ঘড়িটা চুরমার করে পুকুরের জলে ফেলে দিলাম।

সকালে আশ্রমে গিয়ে দেখি—আমাদের হেডমাষ্টার নিধিরাম বাবুতে আর গুরুদেবে তর্ক বিতর্ক হ'চ্ছে। গুরুদেব বলছেন—দেখুন হেডমাষ্টার বাবু, বিশ্বাস করুন আমার কথা—আমি কোনদিন আপনার কোন ছাত্রকে এমন কথা বলিনি যে—তোমাদের স্কুল ন্যাশনাল স্কুল না হলে বয়কট কর। নিধিরাম বাবু বল্লেন—তারা যদি বলে সে কথা ? গুরুদেব বল্লেন—তারা ব'লবে আমি স্কুল বয়কট করতে শিখিয়েছি ? নিধিরাম—তারা কি ঠিক ঐ কথা বলবে, তবে যা বলবে তাতে এই প্রমাণ হবে ! গুরুদেব—আপনার ছাত্রেরা যারা দুধে দাঁত প'ড়াতে না প'ড়তে আপনার শিক্ষাধীনে এসেছে তারা মিথ্যা কথা বলে আর কি ! নিধিরাম—তারা কি সত্যি সত্যি ঐ কথা বলবে, তবে যা ব'লবে তার মানে ও কথা ভিন্ন আর কিছু হয় না।

একটু হেসে গুরুদেব বল্লেন—দেখুন নিধিরাম বাবু, আমি অবশ্য শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি এবং এখনও যে না করি তা নয়। আর এ কথাও ঠিক—আমার

প্রদর্শিত শিক্ষা-প্রণালী আপনাদেব প্রদত্ত শিক্ষা-প্রণালী হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু সে আলোচনা এখানে তত বেশী করিনি; আর তা শুনেছে যে সব ছাত্র তাদের সংখ্যাও এত কিছু বেশী নয়! তবে আমার কথা শুনে যদি তারা স্কুল বয়কট করতে উদ্যত হয়ে থাকে—তা হ'লে আপনার একটু ভাবনার কারণ আছে বৈকি! স্কুলকে ন্যাশনাল স্কুল করা ভিন্ন আপনাদের আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু আপনার সে ভয় করবার বাস্তবিক কোন কারণ নাই। এটা ছেলেদের একটা ভাবের তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নয়! ক'লকাতা হতে সংবাদপত্রের সাহায্যে আমদানী। দু'দিন চুপ করে থাকুন—সব একদম থেমে যাবে।

নিখিরাম—তা আপনি যাই বলুন, আপনি এখানে আসার পর গ্রামে বেশ একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। চাষারা ভদ্রলোকদের সম্মান করা একদম ছেড়ে দিয়েছে বল্লেই হয়। আর ছেলেরা বাপ, মা, গুরুজনদের কথা শুনা কর্ত্তব্য বলে মনে করে না।

গুরুদেব—এত খানি যে হয়েছে তাত জানতাম না। আমি কত দিনই বা এসেছি! আপনাদের এতদিনের শাসন অনুশাসন আমার একদিনের কথায় যদি লোপ পায়—তা হলে স্বীকার করতে হয় শিক্ষার ভিতর বিশেষ গলদ আছে।

নিধিরাম বাবু আর তর্ক বিতর্ক না করে উঠে দাঁড়ালেন এবং বল্লেন—যাবার আগে একটা কথা বলে যাই—আপনি ভদ্রলোক, বিপদে পড়েন আমাদের সে ইচ্ছে নয়। জানবেন, এখানে থাকা আপনার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। সি, আই, ডি, আপনার পেছনে লেগেছে। আমরা এতদিন বাঁচিয়ে এসেছি, আর বোধ হয় পেরে উঠব না।

গুরুদেব বল্লেন—"আমাকে জেলে যেতে হবে এই কথা বলছেন? দেখুন রাজ-আতিথ্য যদি আমার ভাগ্যে লেখা থাকে, সাধ্য কি আপনারা তা খণ্ডন করেন? আমার ওই স্থানটার উপর অনেক দিন থেকে কেমন একটা আকর্ষণ আছে। ওখানকার অধিবাসীদের সাথে মিলেমিশে তাদের মনের কথাটি জানবার কৌতূহল আমার মনে প্রায়ই হ'য়ে থাকে। কিন্তু এতদিন ওখানকার পথটা খুব সোজা হলেও অনেকের পক্ষে অত্যন্ত দুর্গম ছিল। কিন্তু সরকার বাহাদুরের নূতন আইনের বলে পথটা এখন খুবই সুগম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাইত তিলক, গান্ধি, দেশবন্ধু প্রভৃতি মহাত্মাদের পায়ের ধূলো পড়ে সে স্থানটা ভারতবর্ষের আজকাল সবচেয়ে বড় তীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে তীর্থ দর্শনের সৌভাগ্য যদি অদৃষ্টে থাকে, দুঃখ করবার কিছুই দেখি নাত তাতে!" নিধিরাম বাবু চলে গেলে আমাকে বল্লেন—"দেখ, আমাকে বোধ হয় কিছু দিনের জন্য জেলে

বাস করতে হবে—হেড মাষ্টারের কথায় ত তাই মনে হয়। আমাকে যেদিন ধরতে আসবে, তোমরা কোন রকম হৈচৈ ক'র না বা পুলিশকে কোন রকম বাধা দিও না। তা যদি কর তা হলে জানব—তোমাদের মধ্যে আমার এতদিনের বসবাস বৃথা হয়েছে। আর একটা কথা—আমাকে বাঁচাবার জন্য তোমরা কোনরূপ চেষ্টা ক'র না।" আমার দুই হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লেন—"প্রতিজ্ঞা কর আমার অনুরোধ রক্ষা করবে?" আমি কি করি? অগত্যা তাঁর কথায় স্বীকৃত হ'লাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন—"তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে তোমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে। বলে ফেল এই বেলা। কাল হয়ত এ সুযোগ নাও পেতে পার।" আমি গত কল্যাকার সমস্ত ব্যাপার তাঁকে বল্লাম। তিনি শুনে বল্লেন—"দেখ, তোমার বিয়ের কথা এর আগে ভেবে দেখেছি। তোমার এখন বিয়ে করার সময় আসেনি। আর বিয়ে করবে তুমি কেন? বংশ রক্ষার জন্য? কার বংশ তুমি রক্ষা করবে? তিনকড়ি মুখুয্যের বংশ ত নয়ই—কেননা তাঁরা তোমাকে ত্যাগ করেছেন। রায় বাহাদুরের বংশের পরিচয় তোমার পুত্রদের দিয়ে দেওয়ার চেয়ে অতবড় মিথ্যাত সংসারে আর থাকতে পারে না। আমার মনে হয় তোমার পক্ষে দু'টি পথ খোলা আছে। এক বিয়ে

না করে চিরকুমার থেকে দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করা, নয় একটা নূতনবংশের পত্তন করা—মুখুয্যেরও নয় চাটুয্যেরও নয় তোমার নিজের। তা করতে হলেত অর্থের আবশ্যক; তোমার সে অর্থ কোথায়? রায় বাহাদুরের সম্পত্তি আইনতঃ তোমার হলেও ধর্ম্মতঃ তোমার হতে পারে না।"

আমার সে সময় বাস্তবিক বিয়ে করার কোন ইচ্ছা ছিল না। গুরুদেবের কথায় আমার অনিচ্ছাটা আরও দৃঢ় হ'য়ে গেল। বাড়ীতে ফিরে যেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি—দেখি আমাদের হেডমাষ্টার বাবু কর্ত্তার ঘর হতে কি যেন বলতে বলতে বের হচ্ছেন। আমার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় সহসা তাঁর মুখের কেমন যেন পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। তিনি সেই মুহূর্ত্তে আপনাকে সংযত করে নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন। আমি ঘরে গিয়ে ভাবতে লাগলাম—এ সময় নিধিরাম বাবুর হঠাৎ কর্ত্তার কাছে আসা কি জন্য? গুরুদেবকে ধরিয়ে দেবার পরামর্শ করতে নয়ত? আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টার নিধিরাম বাবু যে সে ব্যক্তি নন। তাঁকে লোকে ভয় করত কি ভক্তি করত—অনেক সময় ঠিক বুঝে উঠা কঠিন হ'ত। স্কুলের ছাত্ররা আর মাষ্টার মশায়রা তাঁর সাথে কথাবার্ত্তা বলত আর ব্যবহার করত—তা প্রথম দৃষ্টিতে ভক্তি বলেই

মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে ওটা ভক্তি নয়—ভয়। ওঁকে নেড়ে কেউ যে সহজে নিষ্কৃতি পেয়েছে এমন ঘটনা কখনও ঘটেছে কিনা ঠিক জানি না। লোকটির মস্ত একটা গুণ ছিল। বাইরে ওকে কেউ কখনও রাগ করতে দেখেনি, অথচ রাগ তাঁর ছিল সকলকার উপর। সেটা তাঁর মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যেত। এক মুখ দাড়ি গোঁফের ভিতর কখনও যে কুন্দ বিকশিত হ'য়েছে এ দুর্ণাম তাঁর অতি বড় শত্রুও দিতে পারে বলে মনে হয় না। মুখখানি দেখলে ছেলেরাত দূরের কথা—ছেলেদের বাপ-দেরও ভয়ে মুখ শুকিয়ে যেত। নিধিরাম বাবুর প্রতি এই শ্রদ্ধা বা ভয় কতটা তাঁর স্বোপাৰ্জ্জিত তাঁর পদে-গৌরবে আর কতটা যে রায় বাহাদুরের প্রধান সচিব হিসাবে—তা ঠিক করে বলা খুব সহজ বলে মনে হয় না। আমার সন্দেহটা যে অমূলক নয় সেটা টের পাওয়া গেল পরদিন বিকাল বেলায়।

গ্রামময় রাষ্ট্র আশ্রমে পুলিশ এসেছে সাধুজীকে গ্রেপ্তার করতে। আমি সংবাদ শুনবা মাত্র আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। দেখলাম আশ্রমে লোকে লোকারণ্য, পুলিশ আশ্রমটি খানাতল্লাসী করতে আরম্ভ করেছে। গুরুদেব স্থিরভাবে তাঁর বসবার যায়গাটিতে বসে আছেন—ঠিক যেন ধ্যানে মগ্ন যোগী পুরুষ। খানাতল্লাসী শেষ হলে গুরু-

দেবকে গ্রেপ্তার করে থানার দিকে নিয়ে চল্ল। সাঁওতাল-দের পাড়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার সময় কয়েকটা সাঁওতাল ছুটে এল গুরুদেবকে ছিনিয়ে নিতে। তিনি মিষ্ট কথায় ও মধুর ভৎর্সনায় তাদের সকলকে সে কার্য্য হতে নিবৃত্ত করলেন। আমি সেদিন কি করে বাড়া ফিরে এসেছিলাম ঠিক মনে নাই।

সকালে আশ্রমে গিয়ে দেখি—প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর পূজামণ্ডপের যে দশা—আশ্রমটিরও যেন সেই দশা হয়েছে। দীনু বাগ্দী পূর্ব্বেরই মত অঙ্গনটি ঘ'সে মেজে পরিষ্কার করছে। কয়েকটা দুলেদের ছেলে গুরুদেবের স্বহস্ত-রোপিত ফুলগাছ হতে ফুল তুলে নিয়ে তাঁর আসনের উপর রেখে, ভক্তিভরে প্রণাম করছে। আমিও তাদের এই পূজায় যোগদান না করে থাকতে পারলাম না। আমার আসার কথা প্রচার হবা মাত্র সকল ভক্তই একে একে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। সকলেরই মুখ যেন বিষাদ-মলিন। আমি তাদের বল্লাম—গুরুদেবের প্রতি যদি আমাদের ভক্তি থাকে, অমন চুপচাপ বসে থাকলে ত চলবে না। তাঁর আদিষ্ট কাজ করাইত আমাদের তাঁর একমাত্র সেবা করা হবে। গুরুদেব ফিরে এসে যেন দেখতে পান—আমরা তাঁর প্রদর্শিত পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছি। আমরা সকলে তাঁর আসন ছুঁয়ে শপথ করলাম—বিলাতী কাপড় স্পর্শ করব

না, বিদেশী দ্রব্য যথাসম্ভব বর্জ্জন করব। সেই হতে আমাদের আশ্রমটিতে চরকা কাটা ও কাপড় বোনার ধূম লেগে গেল। আমাদের আশ্রমের কাপড় নিয়ে আমরা গ্রামে গ্রামে ফেরি করে বেড়াতে লাগলাম। তখন খদ্দর তৈরী আর তার প্রচার আমাদের একমাত্র ব্রত হ'ল।

একদিন খদ্দর বেচতে নন্দীগ্রামে উপস্থিত হ'লাম। তখন ফাল্গুন মাস। নব বসন্তের পরশ লেগে ধরণী যেন শিউরে উঠেছে। বনে বনে লতায় পাতায় যেন ফাল্গুনের আগুন লেগে গিয়েছে। একটা 'বউ কথা কও' পাখী অভিমানিনীর মান ভাঙ্গাবার জন্য চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেলছে। আমের মুকুলের সৌরভে চারিদিক আমোদিত করে তুলেছে। কিসের একটা অজানা উত্তেজনার আবেশে আমার চিত্ত বার বার চঞ্চল হ'য়ে উঠছিল। কাপড়ের মোট ঘাড়ে ক'রে আমার জন্মদাতা তিনকড়ি মুখুয্যের বাড়ীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। বাড়ীটা একেবারে অপরিচিত বলে মনে হতে লাগল। সে আমগাছটিও নাই, সে ফুলগাছটীও নাই—যাদের তলায় রাধারাণী ও আমাতে কতদিন সকাল বিকালে কত খেলা খেলেছি, কত আম কত ফুল কুড়িয়েছি। সে খড়ের ঘরখানিও নাই —যাতে দাদাতে আমাতে কত রাত্রি গলা ধরাধরি করে সুখের স্বপনে অতিবাহিত ক'রেছি। দিব্যি একতালা পাকা

বাড়ীটি, সামনে একটা ফল ফুলের বাগান, তার পাশেই গোলাবাড়ী। গুরুদেব সত্যই বলেছেন, আমার ত্যাগের গুণেইত আজ আমার জন্মদাতা বাপের এই ঐশ্বর্য্যের অভ্যুদয়। মনের মধ্যে সে সময় কিসের একটা গর্ব্ব অনুভব না করে থাকতে পারা গেল না। বাড়ীর সামনে ঘাসের উপর কাপড়ের মোটটি নামিয়ে উপস্থিত লোকদের কাপড় দেখাতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বাদে আমার গর্ভধারিণী মা এসেও কাপড় দেখতে আরম্ভ করলেন। সব কাপড় দেখা হলে—"ভদ্দর লোক এমন কাপড় পরতে পারে" ব'লে বিরক্তির সঙ্গে বাড়ী প্রবেশ করে ভেতর হতে দরজা বন্ধ করে দিলেন। নিতান্ত অপরিচিতের মতই ফিরে এলাম—আমার নিজের গর্ভধারিণীর কাছ হ'তে, আমার জন্মভূমি হতে—যেখানকার মাটিতে আমার এই পৃথিবীর সাথে প্রথম পরিচয়। রাস্তা দিয়ে এলাম গেলাম, কত লোকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করল। আমাকে কিন্তু কার্ত্তিক বলে কেউ চিন্তে পারলে না। মাঝের পাড়ার বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীর কাছ দিয়ে যাবার সময় আমার কেবলই মনে হচ্ছিল—একবার যদি রাধারাণীর সাথে দেখা হয়, শুধু নিমেষের জন্য, চোখের দেখা মাত্র! রাধারাণীদের বাড়ীর কাছেই পদ্মসায়র। সেই সে কালের মত এখনও তার জলের উপর রক্তপদ্মের মেলা বসে রয়েছে। ঘাটের উপর একটা মস্ত

বেদী-বাঁধান বকুল গাছ। সেই ছেলেবেলাকার মত আজও তার তলায় কত বকুল ফুল ঝ'রে প'ড়ে রয়েছে। এই ঝরা ফুলের মালা গেঁথে কতদিন না রাধারাণীর গলায় পরিয়ে দিয়েছি। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গাছটির তলায় বিশ্রাম করতে বসলাম। কেন জানিনা, সেই সেকালের মত মালা গাঁথতে সাধ হ'ল। মালা গাঁথা শেষ হলে যেই কাপড়ের মোটটা হাতে করে যাবার জন্য দাঁড়িয়েছি অমনি একটি রমণী কাঁখে কলসী করে পদ্মসায়রে জল নিতে আসছে। নিরাভরণা শ্বেতবসনা, বিধবার বেশ। যৌবন জোয়ার তার দেহের দুই তট যেন প্লাবিত করে দিয়েছে। এ যে রাধারাণী! আমার শৈশবের নিত্যসঙ্গিনী রাধারাণী। আমার দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে বজ্রাহতের ন্যায় থমকিয়ে দাঁড়াল। অমনি শূন্য কলসীটি তার কক্ষচ্যুত হ'য়ে মাটিতে পড়ে গেল। "কে তুমি, কার্ত্তিকদা' নয়?" বলে আমার কাছে আসতে লাগল। ঠিক সেই সময়টিতে ঘন পল্লবিত বকুল শাখা হতে একটা দুষ্ট কোকিল কুহু কুহু করে উঠল। আমি কাপড়ের মোটটি মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। তার শ্লথ অবশ দেহলতাটি আমার দেহখানিকে কি এক নিবিড় আবেষ্টনে জড়িয়ে ধরল। তার সদ্যস্নাত সুদীর্ঘ কেশপাশ আমার সমস্ত পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করে ফেলল।

দূরে একটা আম গাছ হতে একটা পাপিয়া পিউ-পিউ করে উঠল। এক ঝাঁক মৌমাছি গুণগুণ করতে করতে আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। আমার সদ্য-গাঁথা বকুল-হারটি রাধারাণীর গলায় পরিয়ে দিয়ে আমি অনিমেষ-নেত্রে তার মুখের পানে চেয়ে রইলাম। এমন সময় রাধারাণীর বাড়ীর রাস্তা হতে একটা হাঁড়িচাচা পাখী চীৎকার করে উঠল। আর তার চেয়ে কর্কশ গলায় রাধার পিসী শ্যামাঠাকুরাণী "পোড়ারমুখী, একি কেলেঙ্কারী করলি" বলে রাধারাণীকে তিরস্কার করতে লাগল।

বাড়ী ফিরে এসে শুনলাম, কর্ত্তা আমার খোঁজ করছিলেন। সন্ধ্যার পর আমাদের বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয় আমাকে ডেকে বল্লেন—"কিছুদিন হতে কর্ত্তার শরীর ভাল চলছে না, আর কর্ত্রী ঠাকুরাণীও এক পা জলে এক পা ডাঙ্গায় দিয়ে আছেন বল্লেই হয়। তাঁদের ইচ্ছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার বিয়েটা দিয়ে যেতে চান।" আমি বল্লাম, "বিয়েত আমার হ'য়ে গিয়েছে।" তিনি বিস্মিত নয়নে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—"হ'য়ে গিয়েছে? কোথায়? কার সাথে?" আমি রাধারাণীর নাম করলাম। তিনি বল্লেন—"রাধারাণী? নন্দীগ্রামের বাঁড়ুয্যেদের রাধারাণী? সে ত বালবিধবা।"

আমি বল্লাম—"হাঁ, সেই বিধবার সঙ্গেই আজ সকালে মালা বিনিময় হয়েছে।" তিনি বিকৃত স্বরে বল্লেন—"একেবারে অধঃপাতে গিয়েছ? তোমাকে যে সকলে ভাল ছেলে বলত হে? আমি তখনি কর্ত্তাকে বলেছিলাম, ছোঁড়াটাকে ঐ ভণ্ড মানুষটার কাছে যেতে দেওয়া ভাল কাজ হচ্ছে না; শুনলেন না তিনি আমার কথা। এখন তার ফল ভোগ করুন।" এই বলে সেখান হতে চলে গেলেন। ছুদিন পর আমার জন্মদাতা বাপ ও রাধারাণীর এক কাকা আমাদের বাড়ীতে এসে দেওয়ানজীর সঙ্গে গোপনে কি পরামর্শ করে গেলেন। পরদিন সকালে উঠে শুনলাম গত রাত্রে রাধারাণীকে কয়েকটা ছুষ্ট লোক চুরী করে কোথায় নিয়ে গিয়েছে তার কোন সন্ধান মিলছে না। আমি কয়েকটা ছুলে ও সাঁওতাল সঙ্গে করে রাধারাণীর সন্ধানে নন্দীগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে গিয়ে দেখি পদ্মসায়রের ঘাটে লোকে লোকারণ্য। রাধারাণীর কাকা মাথায় হাত দিয়ে বিমর্ষভাবে বসে আছেন। আমাকে দেখে চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন—রাধারাণী আজ সকালে জলে ডুবে মরেছে; তার মৃতদেহ ঐ বকুল তলায় উঠিয়ে রাখা হয়েছে। আমি পাগলের মত ছুটে গিয়ে রাধারাণীর মৃতদেহকে জড়িয়ে ধরে তার

পাণ্ডুর ওষ্ঠে একটু চুম্বন করলাম। আমার দেওয়া শুকনো বকুল হারটী তখনও তার গলায় রয়েছে দেখলাম।

তারপর কয়েকদিন আমার যেন কোন জ্ঞান ছিল না; পথে পথে কেবল ঘুরে বেড়াতাম। একদিন গুরুদেবের একখানি পত্র পেলাম। তিনি লিখেছেন—তাঁর জন্য যেন অকারণ কোন অর্থ ব্যয় না হয়। আশ্রমের কাজ-কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়ে শেষে লিখেছেন—"বৎস, স্মরণ রেখ—ত্যাগই তোমার একমাত্র মন্ত্র।" আমি মনে মনে বল্লাম—গুরুদেব, আপনি সত্যই বলেছেন—ত্যাগই আমার একমাত্র মন্ত্র, আমার অন্য মন্ত্র নাই। সেই হতে দ্বিগুণ উৎসাহে আমরা আশ্রমের কাজে মনোনিবেশ করলাম।

জানিনা কেন—রাধারাণীর মৃত্যুর পর রায়বাহাদুরের মনের পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তিনি আমাকে একদিন নির্জ্জনে ডেকে বল্লেন—"আমার এখানকার মেয়াদ শেষ হ'য়ে এসেছে। আমার মৃত্যু পর তুমি পদ্মসায়রের ঘাটের উপর একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করে রাধাশ্যামের যুগল-মূর্ত্তি স্থাপন ক'রো। আর যদি সম্ভব হয়, বাঁড়ুয্যেদের রাধারাণীর একটি প্রস্তর মূর্ত্তি সেই মন্দিরের বারান্দায় প্রতিষ্ঠিত করো। তোমার গুরুদেব জেল হতে ফিরে এলে তাঁকে আমার নমস্কার দিয়ো। আর বলো তিনি যেন আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করেন।"

—সমাপ্ত—

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

বাঘের বাচ্চা

(ডাক্তারী উপন্যাস)

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

নভেল বলিতে লোকে যাহা বুঝে, "বাঘের বাচ্চা" ঠিক সে শ্রেণীর উপন্যাস নহে। প্রেমের কথা না থাকিলে নভেলই হয় না, "বাঘের বাচ্চা"য় তাহার অভাব নাই। তাহার উপর ইহাতে একটি আদর্শ চিকিৎসকের চিত্র দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। মানসী ও মর্ম্মবাণী, হিতবাদী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষরূপে প্রশংসিত।

নদীয়া জেলার কেদারগঞ্জের জমিদার বাবু কেদার নাথ রায় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন,—

"আপনার 'বাঘের বাচ্চা' আমার **জীবন দান** করিয়াছে। আমি এক বৎসর ধরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলাম। দেশে, কৃষ্ণনগরে ও কলিকাতায় চিকিৎসা করাইয়া কোন ফল না পাইয়া আমি জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া বসিয়াছিলাম। এমন সময় আপনার পুস্তকখানি আমার হাতে পড়ে। বইখানি পড়িয়া আমি আমার জামাতা শ্রীমান রাজারামকে আপনার পরামর্শ লইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম। মহাশয় আমাকে ঔষধপত্র বন্ধ করিয়া ৩ মাস রাঁচিতে থাকিতে উপদেশ দেন। আপনার উপদেশ অনুসারে আমি ৩ মাস রাঁচিতে থাকি। দেড় মাস বাস করার পর আমার জ্বর ভাল হয়। আমি আরও দেড় মাস তথায় থাকি। পূর্ব্বে আমি এক পা-ও

নড়িতে পারিতাম না। রাঁচিতে আমি অবাধে ২ মাইল বেড়াইতে পারিতাম। এখন কৃষ্ণনগরে আছি—৫।৬ মাইল বেড়াইতে পারি।"

সন্তান-পালন। মূল্য ১৵০ আনা।

সন্তান পালন সম্বন্ধে এমন পুস্তক বাঙলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নাই। **সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির** প্রতিষ্ঠাতা সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, এম্‌-এ, আই-সি-এস, মহাশয় "সন্তান পালন" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে পত্রে লিখিয়াছেন, —

* * * * I have no hesitation in saying that it is an excellent production and will be invaluable to the Mothers of our race as a complete but concise compendium for the care of their infants and children. I do not know of another such useful book on the subject in Bengali literature. I congratulate you on your success in producing such useful book and I gladly agree to your dedicating it to Saroj Nalini who yearned to better the lot of the mothers and children of Bengal. * * * *

Yours sincerely G. S. Dutt, M. A., I. C. S.

Magistrate & Collector, Birbhum.

স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা ও দার্জ্জিলিং মহারাণী হাই স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী পুস্তকখানি পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন. :—

"শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগচী মহাশয় রচিত 'সন্তান পালন' পুস্তকখানি পড়িয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। তিনি যে কেবল সুচিকিৎসক তাহা নহে, মনের চিকিৎসাও জানেন; শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে চিকিৎসকের উক্তি শিরোধার্য্য, কিন্তু তিনি যেখানে মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন সেখানে কেবল চিকিৎসকের জ্ঞান লইয়া যান নাই। সেখানে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও কবির রসানুভূতি দেখিতে পাই। মনস্তত্ত্ব না বুঝিলে শরীরতত্ত্বও বুঝা যায় না। তিনি মনস্তত্ত্বেরও উপর গিয়াছেন; একেবারে পরমতত্ত্বে পৌঁছিবার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিক্ষার ভিতর সেই অবিচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের পথ বুঝিতে পারাই চরম কথা। আনন্দের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিলে যে জীবনে একটী আশ্চর্য্য শক্তি ও সামঞ্জস্যের ভাব ফুটিয়া ওঠে এইটী একটী বড় কথা।

বাস্তবিকই বাগচী মহাশয় সুদক্ষ ও বিচক্ষণ চিকিৎসক—কেবল দেহের নহেন, হৃদয়, মন, ও আত্মারও চিকিৎসক বটে। শিশু পালনের দায়িত্ব তিনি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি ঘরে ঘরে জননীদের নিত্যপাঠ্য হওয়া উচিত।"

হেমলতা দেবী

নর্থ ভিউ, দার্জ্জিলিং।

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের দর্শন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও গাইবাঁধার প্রথম মুনসেফ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—আপনার প্রণীত "সন্তান পালন" বইখানা পড়িয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। সন্তান পালন

যে একটা শিক্ষণীয় বিষয়, এবং উহার উপর যে একটা জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে. এ চিন্তা করিবার অবসর কাহারও দেখা যায় না।

আপনার পুস্তকে শিশুর রক্ষা ও শিক্ষা সম্বন্ধে আবশ্যকীয় যতগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় হওয়া সম্ভব, তাহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে * * * * পুস্তকখানি পাঠ করিয়া শিশুর, পিতা, মাতা, ধাত্রী ও শিক্ষকেরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবেন এবং লিখিত উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে সন্তানগণ নীরোগ-দেহ ও সুশিক্ষিত হইয়া জাতির আদর্শ স্বরূপে পরিণত হইতে পারিবে।

সন্তান অ-পালন বা কু-পালনের দোষেই যে আমাদের দেশে শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই শিশু মরণ নিবারণ করিয়া সন্তানগণকে সুপালিত ও সুশিক্ষিত করিতে হইবে, পিতা মাতা প্রভৃতির কি কি কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ এই পুস্তকে আছে। শিশুর 'মনস্তত্ত্ব'' অধ্যায়টিতে আপনি যেরূপ ভাবে উহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা গভীর গবেষণাপূর্ণ ও মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গগুলি Ethical ও Sociological উপদেশে পরিপূর্ণ, শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার একত্র সংমিশ্রণ ও উৎকর্ষ সাধনই যে যথার্থ শিক্ষা এ বিষয় আপনি অতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রতি গৃহে সাদরে রক্ষিত ও পঠিত হওয়া উচিত।

"ম্যালেরিয়া" পুস্তক সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদপত্র ও প্রধান প্রধান ডাক্তারগণের মতামত।

Indian Medical Gazette—Excellent little volume on Malaria. We thoroughly recommend the book to Indian Medical Men. We would like to see the book in the hands of every Hospital Assistant in Bengal and we congratulate Dr. Bagchi on having brought out the book.

Bengalee—In the book before us, the author has given the latest researches of experts on the subject with a history of the disease, its treatment and prognosis. We have no doubt the book will be of great service both to the profession and to the lay public.

Amrita Bazar—We have no hesitation in declaring this to be the best book on the subject in Bengalee. We hope it will receive the appreciation from th public, specially from the Physicians practising in the mofussil. The Govt. should recognize the talent and labour of the author.

বঙ্গবাসী—জ্ঞানেন্দ্রবাবু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ; ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণাদি ও চিকিৎসাদি এই পুস্তকে যেরূপ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে, অন্য কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে সেরূপ হয় নাই।

হিতবাদী—ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞাতব্য অনেক কথাই এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত বঙ্গদেশের প্রত্যেকেই তাঁহার ধন্যবাদ করিবে।

বসুমতী—জ্ঞানেন্দ্র বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক; তিনি ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে পারেন। এই পুস্তক চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার্থীগণের অবশ্যপাঠ্য।

ভারতী—ম্যালেরিয়া ব্যাধির হস্ত হইতে শিশুগুলিকে রক্ষা করিতে সকল গৃহস্থই উৎকণ্ঠিত। ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত এই পুস্তকখানি তাঁহারা স্বগৃহে পাঠ করিয়া অভিজ্ঞ লেখকের উপদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইবেন, সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ শুধু ব্যবসায়ীগণের জন্য লিখিত হয় নাই, গৃহস্থ মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

প্রবাসী—গ্রন্থকার সরল ভাষায় ম্যালেরিয়া জ্বরের নিদান ও চিকিৎসা বর্ণনা করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া জীবাণুর অনেক ছবি পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে, ইংরাজী অনভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের এই পুস্তক বিশেষ উপকারী হইবে।

Col. K. P. Gupta, M. A., M, D. F. R. C. S., D. P. H. I. M. S.—A thorough and comprehensive treatise. Will prove useful and instructive work to all readers and might be introduced with profit into Medical and other Schools.

Major N. P. Sinha, M. D., I. M. S.—I am sure all our people are under great obligation to you for your book.

Many Graduates of Medicine of our University will find it a useful reading and the Hospital Assistants and Native Doctors must benefit greatly.

Sir Nilratan Sarker, M. A., M. D., Fellow of the Calcutta University.—An interesting and admirable pamphlet.

Rai Chunilal Bose Bahadur, M. B., F. C. U., F. C. S.—I know of no other book in Vernacular in which the subject has been so exhaustively treated. I am sure both the Medical Students and Practitioners will find your book to be very useful.

R. G. Kar, L. R. C. P.—It is an excellent and up-to-date book. The book is destined to be of the greatest help to the Medical Practitioners of Bengal.

Rai Upendra Nath Bramhachari Bahadur, M.A. M.D., PH.D., F.C.U., Formerly Teacher of Medicine, Camp. Med. School.—A popular book like yours was badly wanting in Bengal and this want has been removed by you.

Hem Chandra Sen, M. D.—A very good book on Malaria. I shall be very happy to hear of its extensive circulation.

Rama Prasad Bagchi M. D., Teacher, Agra Medical School.—The chapters on the symptoms, and treat-

ment of the different varieties of **Malaria** will be very useful to Village Practitioners of **Bengal**.

Kali Khrishna Bagchi, M. B.—An excellent book. Will be very **useful** to Medical and lay men alike.

Surath Ch. Bose, M. A., M. B., Teacher, Col. of Phys. & Surgs.—Very excellent book.

ফার্ম্মেসী, মেটিরিয়া মেডিকা ও থেরাপিউটিক্স্

অতি সহজ ভাষায় লিখিত। ছাত্র ও চিকিৎসক উভয়েরই উপ-যোগী। কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৪||০ টাকা

ফার্ম্মেসী, (স্বতন্ত্র). মূল্য ||৵০ আনা।

প্রথম শিক্ষা শারীরক্রিয়া ও স্বাস্থ্যবিধি

বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক আর দ্বিতীয় নাই। সকলেরই পাঠ করা উচিত। মূল্য ||০ আনা। (৪র্থ সংস্করণ যন্ত্রস্থ।)

সেক্‌সপীয়ারের অনুবাদ

রুচিরোচন (As You Like It) যন্ত্রস্থ।

ভেনিসের সওদাগর (Merchant of Venice) যন্ত্রস্থ।